মুখোমুখি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকৃতি রায়চৌধুরী
প্রিয়বরেষু

প্রশান্ত মিত্র দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক আগে ইন্দিরা নিজে ওই চেয়ার পেতে তাকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছে। এখানে বসে ইচ্ছে করলে রাস্তার লোক চলাচল দেখা যায়। ইচ্ছে করলে সামনের আকাশের খানিকটা দেখা যায়। ইচ্ছে করলে রাস্তার উল্টো দিকের বাড়ি ক'টার জানলা দরজা বা বারান্দার মুখগুলো দেখা যায়। আর কিছুই ইচ্ছে না করলে ইজিচেয়ারে মাথা রেখে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকা যায়।

বেরুবার আগে ইন্দিরা এই শেষের নির্দেশই দিয়ে গেছেন। —কিছু চিন্তা করবে না, কিচ্ছু ভাববে না, মনটাকে একেবারে ফাঁকা করে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে থাকবে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে মার্কেটিং সেরে ফিরে আসছি—ঘরে কি আছে আর কি নেই ক'দিনের মধ্যে তো আর হুঁশ ছিল না—ছেলেমেয়ে দুটোরও যদি বিবেচনা বলে কিছু থাকত—বাবার জন্যে কেবল চিন্তা করতেই ওস্তাদ তারা, ফাঁক পেলেই ছুটছাট বেরিয়ে পড়েছে—নিজে না বেরিয়ে করি কি। মহেশ কাছেই থাকবে, কিছু দরকার হলে ওকে বলো, আর খবরদার টেলিফোন এলে তুমি চেয়ার ছেড়ে নড়বে না—মহেশ ধরবে, কেউ খোঁজ নিলে কি বলতে হবে ওর এতদিনে মুখস্থ হয়ে গেছে। ঠিক আছে?

প্রশান্ত মিত্র হেসে মাথা নাড়লেন ঠিক আছে। বললেন, আমার চিন্তা নিয়ে বেরিয়ে তুমি আবার গাড়ি চাপা পড় না।

ইন্দিরা ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন। কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরলেন। হাতে একটা ছোট টুল। পায়ের সামনে ওটা পেতে দিয়ে বললেন, যখন ইচ্ছে হবে পা তুলে বোসো—আর ভালো কথা, আমি বেরুচ্ছি এই ফাঁকে লুকিয়ে একটা সিগারেট খেলেও কিন্তু ধরা পড়ে যাবে—মহেশ ঠিক আমাকে বলে দেবে।

প্রশান্ত মিত্র মুখ টিপে হেসে বললেন, পি. এম'এর আদেশ শিরোধার্য।

—আ-হা পি. এম'এর কথা কত শোনো তুমি, এ-কানে ঢুকলে ও-কান দিয়ে বেরোয়—শুনলে আর এই বিপাকে পড়তে হত না।

চলে গেলেন। পি এম অর্থাৎ প্রাইম মিনিস্টার। নামে মিল, তাই ইন্দিরা গান্ধী যেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী সেই দিন থেকে ঘরের এই রসিকতা চালু। প্রশান্তবাবু সময়ে সময়ে এখনো ঠাট্টা করেন, ইন্দিরা সাম্রাজ্যের তবু একবার পতন হয়েছিল, মিত্র সাম্রাজ্যের ইন্দিরার পতন বলে কোনো কথা নেই। লাই পেয়ে ছেলেমেয়ে দুটো পর্যন্ত ওই নাম নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে।

...গত চার সপ্তাহ ধরে বাড়ির বাতাসে চাপা উত্তেজনা থিতিয়ে ছিল। সম্ভাব্য শোকের উত্তেজনা। শোক ঠেকানোর উত্তেজনাও বলা যেতে পারে। মোট কথা, সমস্ত ব্যাপারটাই প্রশান্তবাবুর বিবেচনায় একধরণের উত্তেজনা গোছেরই মনে হয়েছিল। হঠাৎ সত্যি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিনা নোটিসে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। বাঁ-কাঁধে আর বুকের বাঁ দিকে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। বেজায় গরম লাগছিল। ঘাম হচ্ছিল। সমস্ত শরীরে যেন পিন ফোটানো হচ্ছিল। এ রোগ তিনি চেনেন। বাবা এই রোগে গেছেন। এক শালা গেল বছর এই রোগে গেছে। অন্তরঙ্গ এক খুড়তুতো ভাই ছ'মাস আগে গেছে। গত দেড় বছরের মধ্যে দু'জন সতীর্থ অর্থাৎ প্রবীন সাহিত্যিক আর একজন কবিবন্ধু এই রোগে চোখ বুজেছে।

তাই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ডেকে তিনি কি হয়েছে বলেছেন। তারপর শুধু বলেছেন, মনে রেখো, যাই হোক কক্ষনো হাসপাতালে নয়।

তারপর আর কথা বলার শক্তি ছিল না। কিন্তু জ্ঞান পুরোমাত্রায় ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে পাড়ার ডাক্তার এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যে দু'জন বড় ডাক্তার। যে লোকের নাম ডাক আছে তার বেলায় অন্তত তড়িঘড়ি বড় ডাক্তার কলকাতায় মেলে। পটাপট কটা ইনজেকশান

দেওয়া হল প্রশান্তবাবু টের পেয়েছেন। তারপর দুটো দিন ঘুম আর ঘুমের ঘোরে কেটেছে।

তৃতীয় দিনে একটু সুস্থ হবার পর থেকে চিকিৎসার আড়ম্বর আর সেই সঙ্গে এই চাপা উত্তেজনা দেখে যাচ্ছেন। দু'দিনের সমাচারও শুনেছেন। দু'জন বড় ডাক্তারই রোগীকে তক্ষুনি হাসপাতালে সরাতে চেয়েছিল। ইন্দিরা বেঁকে বসতে তা হয়নি। দু'জন ডাক্তারই দস্তুরমতো অসন্তুষ্ট তাতে। তারা ছেলেমেয়েকে ডেকে বলেছে, এ অবস্থায় পেশেণ্টকে বাড়িতে রাখা নির্বোধের কাজ হবে। ছেলেমেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। ইন্দিরার এক কথা, চিকিৎসা বাড়িতেই হবে—তার জন্যে দশগুণ খরচ হয় হোক—হাসপাতালে নয়।

হাসপাতালে কেন নয় ছেলেমেয়েও মোটামুটি আঁচ করতে পারে। দাদু থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজন আর বাবার বন্ধুদের এই রোগে যে ক'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের একজনও জীবিত অবস্থায় ফেরেনি। বাবা খোলাখুলি বলতেন, যাবার সময় হলে কোনো পাতাল থেকেই কেউ ফিরবে না—আমার কিছু হলে কেউ হাসপাতালে নেবার নামও করবি না।

প্রশান্তবাবু নিজেও জানতেন হাসপাতাল সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা থাকা কোনো শিক্ষিত মানুষের উচিত নয়। এমন অনেক রোগ আছে যার যথাযথ চিকিৎসা আর আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা শুধু হাসপাতালেই হতে পারে। কিন্তু হাসপাতাল নামটাই তাঁর ব্যক্তিগত অ্যালার্জির মতো। ইন্দিরারও ভয়, জ্ঞান হবার পর স্বামীটি যদি দেখেন হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে আছেন, তক্ষুনি আবার অঘটন ঘটে যেতে পারে।

যাই হোক, প্রশান্ত মিত্র বাড়ির শয্যাতেই ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন এ ধারণা শুধু তাঁর নিজের—বাড়িতে আর এক জনেরও না। তার ওপর বড় ডাক্তাররা নাকি বলে গেছেন আরো কিছু দিন না গেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এই আরো কিছু দিনটা কত দিন তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রশান্তবাবুর।

দুশ্চিন্তা নিজের শারীরিক দিক ভেবে নয়, চিকিৎসার আড়ম্বর, স্ত্রী ছেলেমেয়ে আর খুব ঘনিষ্ট দু'চারজনের গার্জেনগিরির দাপটে। ডাক্তাররা সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করলেও আর চলাফেরা কাজকর্মের স্বাধীনতা দিলেও এরা তা মানবে কিনা সন্দেহ। একটু অনিয়ম করা হয়েছে মনে হলে ইন্দিরা স্নেহমাখা ধমকের সুরে কথা বলেন, ছেলে সুশান্ত আর মেয়ে অনীতা সোজাসুজি ধমকায়, বলে আর তোমার কথামতো কোনো কিছু চলবে না জেনে রাখো। আর খুব ঘনিষ্ঠরা খবর নিতে এলে মা ছেলেমেয়ে তাদের কাছে নালিশ জানায়; এই এই অনিয়ম করা হচ্ছিল বা হতে যাচ্ছিল। শুনে তারাও শুভার্থীর মতো হিতোপদেশ দিয়ে যায়।

ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত মাইল্ড্ করোনারি অ্যাটাক। কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেয়েদের দুশ্চিন্তার কারণে আর প্রচারগুণে রোগীর অবস্থা সকলের কাছেই সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। রেডিও থেকে ফোনে বাড়ির লোকের মুখেই খবর নেওয়া হয়েছে। তারা জেনেছে অবস্থা সংকটজনক—এবং সেই প্রচারই করেছে। খবরের কাগজগুলোতেও একইভাবে এই সংকটজনক অবস্থার খবরই ছড়িয়েছে। ছেলের সঙ্গে কথা বলে কোনো কোনো কাগজের প্রতিনিধি এও লিখেছে, মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রচিত্রনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক প্রশান্ত মিত্রর নিষেধেই তাঁকে হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে সরানো সম্ভব হয়নি। শেষের সময় যদি উপস্থিত হয়েই থাকে, তিনি স্বগৃহেই তার জন্য প্রস্তুত। পরে অপ্রস্তুত ছেলে অবশ্য সরোষে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করেছে, কাগজগুলো মিথ্যেবাদী, আমি কখনো এ-রকম কথা বলিনি।

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই জবাব দিয়েছেন, বলে থাকলেও তো সত্যি কথাই বলেছিস, তোর রাগ হবার কি হল।

এমন প্রচারের যা ফল, তার উত্তেজনা ঠাণ্ডা হতে সময় একটু লাগবেই। প্রথম দিনকতক তো বাড়ির সামনেই কত চেনা অচেনা মেয়েপুরুষের ভিড়। অবস্থা জানানোর জন্য সুশান্তর দুই বন্ধুকে নিচের

দরজায় মোতায়েন রাখতে হয়েছে। এদিকে মুহুর্মুহু টেলিফোন। প্রশান্তবাবুর লেখার ঘর থেকে টেলিফোন অবশ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কারণ, শোবার ঘরের পরেই লেখার ঘর। তবু ফোন এলে এ ঘর থেকেও রিং শোনা যায়। ফোনে খবর জানানোর দায়িত্ব অনীতার অথবা ইন্দিরার। তৃতীয় দিনে একটু সুস্থ হবার পর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাটটা করে ফোন আসার খবর প্রশান্তবাবু পেয়েছেন। ফোনে কারা কারা খবর নিচ্ছে নোট রাখা উচিত এবং এই উচিত কাজে গাফিলতি হয়নি। সমবয়সী আর অনুজ লেখক, পাবলিশার, ছোট বড় মাসিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক, সিনেমার পরিচালক প্রযোজক, প্রশান্তবাবুর স্নেহভাজন অভিনেতা অভিনেত্রী গায়ক গায়িকারা সকলেই বাড়িতে এসে খবর নেবার কর্তব্য পালন করে চলেছে। রোগীর সঙ্গে দেখা করা নিষেধ। ফলে তাদের রোগীর খবর জানানোর দায়িত্ব ইন্দিরার বা ছেলেমেয়ের। প্রত্যহ কারা কারা খবর নিতে এলো ইন্দিরা সন্ধ্যার পর সময় বুঝে স্বামীকে বলেন।

এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রশান্ত মিত্র হাল ছেড়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কি করতে পারেন? প্রচুর সিগারেট খেতেন। পনের দিনের মাথায় ডাক্তার তিনটে পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। এ সপ্তাহ থেকে পাঁচটা। তাতেও ইন্দিরা আর ছেলেমেয়ের বেজায় আপত্তি। একটু আধটু ড্রিংক করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল। ডাক্তারের মতে এ রোগে সিগারেটের থেকে ড্রিংক কম ক্ষতিকর—আরো কিছু দিন গেলে একটু আধটু খাওয়া চলতে পারে। ইন্দিরা আর ছেলেমেয়ে ওই ডাক্তারের ওপর রেগে আগুন। তাদের ধারণা, ডাক্তার নিজে খায় বলেই অমন উদার। ছেলে তার এক বন্ধুর ডাক্তার বাবার সঙ্গে কথা বলে বাড়িতে এসে ঘোষণা করল, এই ডাক্তার আর চলবে না, বাবার মুখ চেয়ে ফতোয়া দেয়, আমি খুব ভালো করে জেনে এসেছি ড্রিংক সিগারেট কোনোটাই একদম চলা উচিত নয়।

মেয়ে আর মায়ের কাছে এই ফতোয়াই অভ্রান্ত। প্রশান্তবাবু মনে

মনে বিরক্ত। বাপের পয়সায় ছেলে দিনের মধ্যে ক'প্যাকেট সিগারেট ওড়ায় ঠিক নেই—লুকিয়ে চুরিয়ে ড্রিংকও একটু আধটু চলে কিনা সে সম্পর্কেও একেবারে নিঃসংশয় নন। কিন্তু মুখে তিনি বাদ প্রতিবাদ কিছু করেন না। এখন বে-কায়দায় পড়েছেন—সময় হলে নিজের যা করার করেই যাবেন এ ওরাও ভালো করেই জানে। জানে বলেই এত কড়া নজরে এখন।

কাঠের টুলে দু' পা তুলে দিয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে গা ছেড়েই শুয়েছিলেন প্রশান্ত মিত্র। মাথার মধ্যে সেই হিজিবিজি ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেল। হিজিবিজি ব্যাপার বলতে কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা। কোনোটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই এমন সব আধা ঘুমের মধ্যে যেমন অজস্র ছাড়া-ছাড়া চিত্র ভেসে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়, তেমনি। কাউকে বলেন নি, একেবারে ছেলেবেলা থেকে এ-রকমটা হয়ে আসছে।

একরাশ বিক্ষিপ্ত চিন্তার মিছিল মগজের মধ্যে যেন মূর্তি ধরে সার বেঁধে চলতে থাকে। মানুষের চরিত্র বিস্তারে সিদ্ধহস্ত শিল্পী তিনি। যে চরিত্র কলমের ডগায় অবয়ব ধরে, তার ভেতর-বার পাঠককে আয়নায় দেখিয়ে দিতে পারেন। অতিবড় রূঢ় সমালোচকও চরিত্র বিশ্লেষণে প্রশান্ত মিত্রর মুক্তি নেই ভাবেন। অনেক সময়েই তাঁরা লেখেন, মানুষের চরিত্রের গভীরতম অন্তঃপুরে অনায়াসে ঢুকে পড়ার যাদুকাঠিটি এই এক লেখকের হাতের মুঠোয়। আর তাঁরই মগজের মধ্যে এমন এমন এলোমেলো হিজিবিজি চিন্তার মিছিল সার বেঁধে চলতে থাকে এ নিজের কাছেই বরাবর একটা কৌতুকের ব্যাপার।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন প্রশান্তবাবু। মাথায় একটা মতলব এসেছে। ওই এলোমেলো অথচ জীবন্ত চিন্তার মিছিলকে যদি কাগজে কলমে ধরে রাখা যায় তো কি দাঁড়ায়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মহেশকে ডেকে হুকুম করলেন, আমার কালো নোটবই আর পেনটা দিয়ে যা—

মহেশ দ্বিধান্বিত। মনিব এটা উচিত কাজ করছেন না, আর মা শুনলে বকবেন এ সে-ও জানে।

—কি বললাম কানে গেল?

মেজাজের আভাস পেয়ে মহেশ ঘর থেকে মস্ত কালো নোট বই আর কলম রেখে গেল। এ নোট বইটা বাড়ির সকলেরই খুব চেনা, কিন্তু কেউ আর এখন এটা খোলে না। লেখার কোনো প্ল্যান বা প্লট মাথায় এলে এতে লিখে রাখেন। কিন্তু নোট করার পদ্ধতি এমন বিচিত্র যে দেখে বা পড়ে কারোই তেমন বোধগম্য হবে না। জ্যামিতিক নক্সার মতো মনে হবে। তার মধ্যে তু'চারটে নাম, তু'চার অক্ষরে একটা-তুটো ঘটনা, তার মধ্যে অ্যারো টেনে কোথাও সার্কেল কোথাও ট্রায়েঙ্গেল কোথাও বা রেকট্যাঙ্গেল। তিনশ পাতার লম্বা বাঁধানো এই নোট বইয়ের প্রায় তু'শ পাতা এই গোছের প্লটের নক্সায় বোঝাই। আর তার প্রায় সবগুলোতেই লাল দাগ মারা। অর্থাৎ যে প্লট বা প্ল্যানগুলো নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে তাতে ওই লাল দাগ পড়ে। ইন্দিরা আর ছেলেমেয়েও তাঁর এই প্ল্যান অথবা প্লটের বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয় না বলে কৌতূহল গেছে।

নোট বইটা খুলে ছোট টুলের ওপর রেখে আজ আর কোনো প্লটের ছক কাটতে বসলেন না প্রশান্ত মিত্র। ওই চিন্তার এলোমেলো মিছিল যেমন আসে তেমনি সাজানোর সংকল্প। ···খুব ছেলেবেলা থেকেই ধরা যেতে পারে। চোখ বুজলে সেই ন'বছরের ছেলেটাকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। তার উদ্ভট চিন্তার কারিকুরিও।

"···ইস্কুল যেতে ইচ্ছে করছে না। অঙ্কের মাস্টারটা বেত নিয়ে ক্লাসে ঢোকে। অঙ্ক ভুল হলে শপাশপ মারে। হি-হি-হি-হি—ওই মাস্টারের পিঠেই বৃষ্টির মতো বেতের ঘা পড়ছে। যন্ত্রণায় মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। হি-হি-হি—কিছু দেখতেও পাচ্ছে না বুঝতেও পারছে না। অদৃশ্য মানুষ হয়ে কে মারছে জানবে কি করে?··· মা-টা যাচ্ছে-তাই। অতবড় পাটালি থেকে এক ডেলা মাত্র ভেঙে দিল। কি দারুণ

খেতে। বেশি খেলে পেট কামড়াবে না হাতি। বড় হয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। আর প্রাণের সাধে পাটালি খেতে হবে। ওই ঘাড় গোঁজা ধ্যাবড়া মোটা জলের কলটা। বিচ্ছিরি। ভূতেরা নিশ্চয় ওই রকম দেখতে। ও-মা! তীরের মতো সাইকেলটা যে গায়ের ওপর এসে পড়ছে। দাঁড়াব? ছুটব? দাঁড়াব? দাঁড়াব? না ছুটি। গেল গেল গেল! সব অন্ধকার। দারুণ যন্ত্রণা। মাটি থেকে কে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। অন্ধকার একটু কমছে। দাওয়ায় আঠের-উনিশ বছরের যে মেয়েটা সে-ই বুকের সঙ্গে জাপটে নিয়ে ছুটে বাড়িতে ঢুকছে। তার বুকটা কি নরম আর কেমন অদ্ভুত লাগছে। হি-হি-হি-হি। এ-মা ব্যাটাছেলে সাইকেল চাপা পড়ে। পাশের বাড়ির খুকুটা ছুটে ভিতরে পালিয়ে গেল। ধরা গেল না। হাত পা গা মুখের জ্বালা উঠে একাকার আর ওই মেয়ের হাসি। ধরতে পারলে মজা বুঝবে। ···আচ্ছা, ওই যে মেয়েটা বুকে জাপটে তুলে নিয়ে গেছল, খুকুটা বড় হলে তার মতো হবে? ওরও ওই রকম বুক হবে? মা মাসি খুড়ি জেঠি নয়, তাদের থেকে ঢের কম বয়সী মেয়েদের সক্কলের মধ্যে কিছু একটা মজা লুকিয়ে আছে। খুব জানতে ইচ্ছে করে। বুঝতে ইচ্ছে করে। খুকুটা বেজায় ছোট। তবু ওকেই একদিন ধরে গায় পিঠে হাত বুলিয়ে আর টিপেটিপে দেখতে হবে।·······”

প্রশান্তবাবু কলম রাখলেন। ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি। একটা আস্ত না হোক আধখানা সিগারেট খেলেও ভালো লাগত। থাকগে। ইন্দিরা চেঁচামেচি করবে। এই কড়াকড়ি ক'দিন আর চলবে। পাঁচ সাত মিনিট ইজিচেয়ারে মাথা রেখে পড়ে রইলেন। এবারে ঠোঁটের ফাঁকে আগের থেকে একটু বেশি হাসি। সোজা হলেন। নোট বইয়ের পাতা উল্টে কলম নিয়ে আবার ঝুঁকে বসলেন।

“···মফঃস্বলের কলেজ নয়তো যেন স্কুল। এক ঘর ছেলে আর সাত-সাতটা মেয়ের চোখের ওপর নাম ধরে দাঁড় করিয়ে পড়া জিজ্ঞেস করা। আগের দিন কোলরিজের রাইম অফ দি এনসেন্ট মেরিনার

শেষ করে আজই আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর ইয়ারো আনভিজিটেড ইয়ারো ভিজিটেড ধরে এতটা এগিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিকে কাল-মন যখন ছিলই না, চুপ করে না থেকে বোকার মতো কেন জবাব দিতে গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কাব্য-প্রকৃতির প্রশ্নের জবাবে কোলরিজের কাব্য-প্রকৃতি দিয়ে উত্তর শুরু করলে ক্লাসসুদ্ধু সক্কলে হেসে উঠবে না তো কি? অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেই যে ওই ত্যাঁদর প্রোফেসার এই একজনকেই ধরেছে তাতে কোন ভুল নেই। সক্কলের সঙ্গে মেয়েদের আলাদা বেঞ্চ থেকে গায়ত্রীও নাস্তানাবুদ মুখখানার দিকে চেয়ে কম হাসছিল না—এটাই বেশি যন্ত্রনার মতো। বয়সে দু'তিন মাসের বড় আর দিদির সঙ্গে ভাব বলে গায়ত্রীরও কথা-বার্তায় দিদি-দিদি ভাব। বিকেলে বাড়ি এসে কিনা বলল, এই হাঁদারাম, ক্লাসে তোমার মনটা থাকে কোথায়?···ফস করে যদি মুখের ওপর বলে বসতে পারত কোথায় থাকে? ক্লাসে বসে আয়েস করে এই গায়ত্রীর মুখখানাই তো দেখছিল।···শুধু মুখখানা? কত কিছু দেখার মধ্যে ডুবে গেলে ক্লাসে অমন ভুলের মাশুল দিতে হয়?···রং একটু কালো হলেও ওই সুঠাম ঢলেশ্বরীর পাশে অন্য মেয়েগুলো সব প্যাঁকাটি।···হকির নক আউট ফাইনালে নিজের দোষেই কলেজ টিমের হার হয়ে গেল। দু'দুটো সোজা গোল মিস করে বসল। বিজয়ীর কাপ হাতে গায়ত্রীকে শৌর্যের মূর্তিখানা দেখানো গেল না। ···কলেজ ম্যাগাজিনে গল্পটা ছাপা হয়েছে আর গায়ত্রীও সেটা পড়েছে নিশ্চয়। নইলে বারো গজ দূরে মেয়েদের আলাদা জায়গায় বসে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিল আর ঠোঁট টিপে হাসছিল কেন। সুলতা সিংহ আর রঞ্জিতা বোস ক্লাস শেষ হতে বলেই গেল, 'জিত' গল্পটা দারুণ হয়েছে। না প্রেম বা বিয়ের গপ্প নয়, একটি খুব সাধারণ ছেলে শুধু হৃদয়ের আশ্চর্য প্রসাদ গুণে কেমন করে এক অহংকারী মেয়ের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠল—সেই গল্প। বিকেলে গায়ত্রী বাড়ি এলো। ওর সামনেই হেসে হেসে দিদিকে বলল, তোমার ভাই এঁচড়ে পেকে গেছে রমাদি, মেয়ে কাকে

বলে জানে না, মেয়ে নিয়ে গপ্‌প লেখা শুরু করেছে।...ক্লাশে গায়ত্রীর সেই চাউনি আর টিপটিপ হাসি দেখেই ভিতরটা কেমন গরম গরম লাগছিল। এই কথা আর এই হাসির পর একটা উষ্ণ বাষ্প ভেতরে সেঁধোচ্ছে। রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত ওই কথা আর ওই হাসি একটা স্পর্শ হয়ে এক অব্যক্ত যন্ত্রণার আগল ভেঙে চলেছে। কত জানে গায়ত্রী যদি জানত। বুক আর দুটো হাতের চাপে পাশ বালিশ-টার দফা প্রায় রফা। কিন্তু ওটা কি পাশ বালিশ নাকি?...রাত দুটো। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ক্লাবের ওরা চুপিসারে এসে জানলায় একবার টর্চ ফেলবে। ফেলল। বালিশের তলা থেকে নিজের টর্চ বার করে একবার জ্বেলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে পাঁচিল টপকে রাস্তায়। ভুতুড়ে অন্ধকারে সকলে মিলে সোজা আড্ডী-বাগানে। গা ছমছম করছে। গোটা বাগানটাই কোনো এক কালের কবরে ছাওয়া। নিজেদেরই পায়ের খসখস শব্দ, অথচ মনে হচ্ছে অশরীরিরা যেন আপত্তি জানাচ্ছে। ছেলেবেলার সেই ঘাড়-গোঁজা থ্যাবড়া মোটা কালের মতো ভূতগুলো অন্ধকারের শরীর ধরে আশপাশে ঘুরঘুর করছে। ধ্যেৎ। এতগুলো জোয়ান ছেলে একসঙ্গে, ভূতের নিকুচি করেছে। একজন টর্চের আলো ফেলতে সামনেই ওই মস্ত লম্বা লোহার বীমটা দেখা গেল। মণ পনের ওজন হবে ভেবে-ছিল। আঠের জনে মিলে হিমসিম খেয়ে ওটা কাঁধে তুলতে মনে হল বিশ মণের কম হবে না। আধ মাইল পথ ভেঙে রাতের অন্ধকারে লোহার বীমটা ক্লাবঘরের পিছনে এনে ফেলতে সকলের কালঘাম ছোটার দাখিল। কাজ সেরে আবার যে-যার বাড়ি। বিছানা। কালই ওই লোহার বীমটা ঠেলায় করে গণেশ সাহার দোকানে চলে যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখন ঘরের দোরে। লোহা লক্করের আগুন দাম। পনের ষোল মণ ওজন ধরেই গণেশ সাহা অনেক টাকা কবুল করেছে। সেই টাকায় ক্লাবের ব্যায়ামের সরঞ্জাম আসবে। নিজের সেই স্বাস্থ্যশ্রী বিছানায় শুয়ে চোখ চেয়েই কল্পনা করতে পারছে। দেখতে পাচ্ছে।

গায়ত্রীও। তার মুগ্ধ চোখে পলক পড়ে না। আঃ, কেলো হারামজাদা আজ আবার পাশ বালিশটা দিতে ভুলেছে। কাল ওর মাথাটা ভাঙবে। টর্চ জ্বেলে পাশ বালিশটা নিয়ে আসতে হল। তারপর ওই মেয়ের আর কত তফাতে থাকবে সাধ্যি ?···কত রোগের কত ওষুধ বেরুচ্ছে, টাইফয়েডের ওষুধ এখনো নেই কেন ? এখন পর্যন্ত কেবল কাজ ভরসা আর সেবা ভরসা কেন ? তাহলেও এই সেবাটুকুর ভার কেবল একজন পেলেই গায়ত্রী ম্যাজিকের মতো সেরে উঠতে পারে। কল্পনায় সেবার ভার নেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখছে গায়ত্রী সেরে উঠছে।···এ কি হল ! এনসেণ্ট মেরিনারেব নাবিকরা পাপ করেছে। তাদের সামনে মঙ্গলের দূত গুলিবিদ্ধ বিশাল অ্যালবেট্রস পাখিটা মরে পড়ে আছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুর্যোগে নাবিকেরা সব পাগল। তারা হিংসা ভুলে আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকছে। শান্তির অনুভূতি ফিরে আসছে।··· কবরের শান্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ অশরীরিরা সব মশারির বাইরে অন্ধকারে ঘুরঘুর করছে। তারা প্রতিশোধ নেবে।···একজনের লোভের পাপ, বাসনার পাপ গায়ত্রীকে স্পর্শ করেছে। গায়ত্রী চরম প্রতিশোধ নিল। গায়ত্রী শ্মশানের আগুনে নিজেকে শুচিস্নিগ্ধ করে নিল। আরামের শয্যায় শুয়ে ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে এই একজনের। ওই নাবিকদের মতো আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে চেষ্টা করছে। মা—মাগো ! ভোর রাতে দু'চোখে ঘুম নামল। মনে হল বালিশে নয়, মায়ের কোলে শুয়ে আছি।··· ··· ···"

নোট বই আর কলম বন্ধ করে প্রশান্তবাবু আবার ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। ভিতরটা বেশ হালকা লাগছে। আরো মিনিট দশেক বাদে ইন্দিরা ফিরলেন। টুলে নোটবই আর কলম দেখে আঁতকেই উঠলেন। —এইজন্যেই তো আমি বেরুতে চাই না, এরই মধ্যে নোট বই আর কলম নিয়ে তুমি লেখার ছক কাটতে বসে গেলে ? ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা ঝাঁঝালো গলায় ডেকে উঠলেন, মহেশ !

সন্ত্রস্ত মহেশ তক্ষুনি হাজির। ইন্দিরা কিছু বলার আগেই প্রশান্ত-বাবু আদেশ দিলেন, দরকার নেই, যা—

মহেশ সরে যেতে হাসি মুখে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, মহেশও আমার ওপরে গার্জেনগিরি করতে পারেনি কেন সেই কৈফিয়ত তলব করতে যাচ্ছিলেন?

ইন্দিরা মনে মনে অপ্রস্তুত একটু। ফলে জবাবের ঝাঁঝ আরো বেশি।—তুমিই বা এমন অবুঝপনা করবে কেন—এখন তোমার লেখার প্লট ঠিক করার সময়?

কালো নোট বই মানেই লেখার প্লটের নক্সা বা খসড়া ভাবেন। জবাব না দিয়ে প্রশান্ত মিত্র গম্ভীর মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ডাকলেন,এসো—

ফোনটা যে ঘরে সরানো হয়েছে সেই ঘরে চললেন। ইন্দিরা পিছনে। দ্রুত এগিয়ে হাত ধরতে পারলেন না। হঠাৎ কি হল ভেবে পেলেন না। স্বামীর এই গোছের গাম্ভীর্যকে একটু সমীহ করেন।

ঘরে ঢুকে প্রশান্তবাবু ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। ডায়েল করলেন। ইন্দিরা এখনো কিছু না বুঝে চেয়ে আছেন। একটু বাদেই স্বামীর কথা থেকে বুঝলেন, কাকে ফোন করা হল এবং লাইনের ও-ধারে কে। হার্ট স্পেশালিস্ট, যিনি গত একমাসের মধ্যে অনেক দিন বাড়ি এসে রোগী দেখে গেছেন।

সাড়া পেয়েই প্রশান্তবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর আমার বিরুদ্ধে ভীষণ নালিশ আছে। তাঁর মুখেই শুনে আপনার যা বলার ওঁকে বলুন—আমার মনে হচ্ছে একমাসেরও পরে এমন কড়াকড়ি চললে আবার আমাকে বিছানা নিতে হবে। ধরুন—

রিসিভারটা ইন্দিরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বিড়ম্বিত মুখ-খানা মিষ্টি লাগছে। অপেক্ষা না করে গম্ভীর মুখেই প্রশান্তবাবু ঘর থেকে নিজের শোবার ঘরে চলে এলেন।

মিনিট পাঁচেক বাদে ইন্দিরা এলেন। অনুযোগের সুরে বললেন, তুমি ডাক্তারকে ঘুষ-টুষ খাইয়ে রেখেছিলে নাকি?

প্রশান্তবাবু শব্দ করেই হেসে উঠলেন। নালিশের জবাবে স্পেশালিস্ট ডাক্তার কি বলে থাকতে পারেন এই থেকেই বোঝা গেল।

ইন্দিরা এবারে উৎসুক একটু:—তা এতবড় অসুখ থেকে উঠেই হঠাৎ কি প্লট মাথায় এল তোমার?

ভিতরে ভিতরে একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলেও প্রশান্তবাবু নির্লিপ্ত জবাব দিলেন, নোট বইটা খুলে নিজেই দেখো কি প্লট।

পাছে সত্যি ওটা খোলে সেই জন্যেই বলা। কাজ হল। ইন্দিরা বললেন, আ-হা, তোমার ওই নক্সা আর আঁকিবুকি দেখে কি বুঝব। শুনিই না কি প্লট, এই অসুখ নিয়ে কিছু না তো?

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই মাথা নাড়লেন। এ-সব কিছু না।

পরদিন। বিকেলে আগের দিনের মতোই প্রশান্তবাবু বারান্দার ইজিচেয়ারে বসেছেন। কাঠের টুলের ওপর নোট বই কলম। ইন্দিরা আজ এ নিয়ে কোনো আপত্তি তোলেননি। বড় ডাক্তার কাল বলেছেন, একটু একটু করে নিজের কাজের মধ্যে ফিরে আসতে চাওয়াটাই সব থেকে সুস্থতার লক্ষণ। পাশের মোড়ায় বসে খানিকক্ষণ কথা-বার্তা বলেছেন। তারপব স্বামীর বিমনাভাব লক্ষ্য করে উঠে গেছেন। নতুন কিছু সৃষ্টির আগের এই তন্ময়তা খুব ভালো চেনেন।

প্রশান্ত মিত্র সত্যিই বিমনা আর তন্ময় হয়ে পড়েছেন কোনো সৃষ্টির তাগিতে নয়। মগজের মধ্যে সেই হিজিবিজি ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। চিন্তার এলোমেলো মিছিল সচল অবাক ছবির মতো সার বেঁধে চলেছে। তারই ভিতর থেকে চোখের সামনে একখানা মুখ ধরে রাখার চেষ্টা। তারই ভিতরের আর একখানা মুখ।

খুব স্পষ্ট করে ধরা গেল। প্রশান্তবাবুর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির টুকরো। নোট বই খুলে কলম নিয়ে ঝুঁকলেন।

"...তাড়াতাড়ি দাড়ি কাটতে গিয়ে গাল কেটে গেল। কাটুক। গলাটাই কাটতে ইচ্ছে করছে। নাকে মুখে গুঁজে এক্ষুনি দশটা পাঁচটার অফিসে ছোটো। চাকরি না তো ফাঁসির দড়ি। ভাবতে গেলে কান্না পায়। পায়ের তলায় মাটি সরে সরে যায়। গলা বুক শুকিয়ে আসে। দু'চোখ সত্যি সত্যি জলে ভরে যায়। রাগে নিজের ওপরেই হিংস্র কিছু করে বসতে ইচ্ছে করে। সকলের অগো-চরে বাথরুমে ছুটে যেতে হয়। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসতে হয়। তারপর চোখ মুখ মুছে পাউডার বুলিয়ে নিলেই সকলের চোখে সপ্রতিভ স্মার্ট। ......যে কাণ্ড এ পর্যন্ত অনেকবার ঘটে গেছে আবারও সেই কাণ্ড। সেকশন অফিসারের সঙ্গে সামান্য কারণে কথা কাটাকাটি, তারপরেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সোজা রাস্তায়। মুক্তির স্বাদ। তারই সঙ্গে অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। মুক্তির স্বাদ থেকে দিনে দিনে আতঙ্কটাই বড় হয়ে উঠছে। শুভার্থীজনেদের উপদেশ শ্লেষের মতো কানে বেঁধে। লিখে আবার এ-দেশের মানুষ খেতে পরতে পায়। নিজের চেষ্টায় আর রোজগারের সর্বস্ব খুইয়ে এ-পর্যন্ত চার চারটে উপন্যাস ছাপা হয়েছে কিন্তু এতটুকু আলোর হদিস কোথাও নেই। কেউ চেনে না। কেউ জানে না। পাবলিশারের কাছে খোঁজ নিতে গেলে মুখ ঝামটা খেতে হয়—বই বিক্রি হয় নি। হলেও হিসেব চাইলে আবার মুখ ঝামটা। মাসিকে সাপ্তাহিকে লেখা পাঠালে অবধারিত ফেরত। পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকের দরজায় ধর্না দিলেও কেউ উল্টে দেখতে চায় না। সম্মানবোধ প্রখর, অথচ সর্বদা মাথা নিচু। আত্মীয় পরিজনের করুণার পাত্র। ...নির্জন দুপুরে ছাতে উঠেছে। তারপর সভয়ে সরে গেছে। নিচের দিকে তাকাতে কে যেন মন্ত্রণা দিচ্ছিল, ইচ্ছে করলে এক্ষুনি সব যন্ত্রণার শেষ হতে পারে।...মায়ের ঠাকুর ঘর। ভিতরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল। তারপর মায়ের পটের সামনে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। মা-গো শুধু এই দাও, যেন কোনদিন কারো গলগ্রহ হতে না হয়।...মা কি শুনল? নইলে দু'মাস

না যেতে হঠাৎ অমন যোগাযোগ কেন। যেখানে ফিচার লিখে ভিক্ষের মতো পঁচিশ তিরিশ টাকা করে হাত পেতে নিতে হত, সেখান থেকেই গল্প লেখার আমন্ত্রণ পেল কেন—গল্পের পরে উপন্যাস লেখার ফরমাস।··· সেই থেকে বৃত্তবদল। বাজারে ফি বছর দু'তিনটে করে উপন্যাসের জমজমাট বিক্রি। ক'টা উপন্যাস সিনেমায় পরপর হীট। প্রকাশকরা যেচে আসছে। ছবির প্রযোজকরা খাতির করছে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছেও খাতির কদর বেড়ে চলেছে।···সুরমা সরকারের ফোন। খিলখিল হাসি। আপনি প্রোডিউসারের কাছে আপনার গল্পের নায়িকা হিসাবে আমার নাম সাজেস্ট করেছেন শুনলাম, অনেক ধন্যবাদ। মঞ্জুশ্রী গুপ্তর সামনা সামনি অভিমান, কিছু বলছেন না মানেই আমার অভিনয় আপনার ভালো লাগেনি। এই শট্টা আর একবার নিয়ে দেখব?···রাতের শয্যায় কল্পনার পথ ধরে ওই দুই অভিনেত্রীকেই চোখের সামনে দেখা যায়। কখনো সুরমা সরকার। কখনো মঞ্জুশ্রী গুপ্ত। ভেতরটা লালায়িত হয়ে ওঠে। হাত দুটো পাশ বালিশের ওপর নিশপিশ করে। ইচ্ছে করলেই কল্পনায় ওদের খুব কাছে টেনে আনা যায়। তারপরেই হাতের ধাক্কায় পাশ বালিশটা ছিটকে মাটিতে পড়ল। আবার? আবার পাপ? গায়ত্রীকে মনে নেই? গায়ত্রী কি-ভাবে শুচিশুদ্ধ হল মনে নেই?···সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে ইন্দিরার ওপর। ওধারে ঘুমে বিভোর হয়ে লতিয়ে পড়ে আছে। ও জেগে থাকলে তো এরকমটা হয় না। ভালো যাকে বাসে সে ইন্দিরা ছাড়া আর কে? ফের মিথ্যে? অন্তত নির্জলা সত্যি কি?···ইন্দিরা যখন তোমার বুকে মাথা গুঁজে ঘুমোয় তখনো কি এক-একসময় ওই রমণী দেহকে কেন্দ্র করে সিনেমার অভিনেত্রী ছেড়ে তোমার বইয়ের নায়িকারা পর্যন্ত কেউ কেউ ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে হাজির হয় না?···

প্রশান্ত মিত্র নোট বই বন্ধ করলেন। কলমও। সিগারেট না খেয়ে পারা যাচ্ছে না। হাঁক দিলেন, মহেশ!

মহেশ এলো।

—তোর মা কোথায় ?

—এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন।

—চলে গেলে ডেকে দিস।

সাত আট মিনিটের মধ্যে ইন্দিরা এলেন। —ডাকছিলে ?

—হ্যাঁ। বড় তেষ্টা।

—সে কি ! ইন্দিরা সচকিত।—মহেশ কোথায়, এক গেলাস জলও দিতে পারেনি !

—জলের তেষ্টা নয়। সিগারেটের।

ইন্দিরা থমকে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ।—আজ এরই মধ্যে একটা বেশি খেয়েছ না ?

মুখ কাঁচুমাঁচু প্রশান্তবাবুর।—তাহলে অন্তত আধখানা…

ইন্দিরা হেসে ফেললেন।—কি যে করো না তুমি। সত্যি আধ-খানা কেটে আনছি ?

দু' মিনিটের মধ্যে ফিরলেন। হাতে আধখানা সিগারেট আর দেশলাই।

প্রশান্তবাবু সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বড় টান দিলেন। ইন্দিরা মোড়া টেনে বসলেন।

—কে এসেছিল ?

—'এই বাংলা'র সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ। তোমার শরীরের খবর নিচ্ছিলেন, কিন্তু আসল মতলব কবে থেকে তোমাকে লেখানো যাবে জানা। ওঠার আগে বলেই গেলেন, এবারে প্রথম যে লেখাটি ধরবে সেটা তাঁর—তোমাকে যেন বলে রাখি।

আধখানা সিগারেট আর দু'তিন টানে ফুরিয়ে এলো। ইন্দিরা বললেন, তার খানিক আগে তোমাদের প্রোডিউসার বিজন চাকলাদার ফোন করেছিলেন, তোমার কি গল্প নিয়ে জরুরী আলোচনা দরকার। আমি বলে দিয়েছি সামনের সপ্তাহের আগে হবে না—তাও কেমন থাকো না থাকো ফোন করে আগে জেনে নিতে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, আসতে বললেই পারতে, টাকারও তো দরকার।

—থাক। যা আছে ওই দুটোর উচ্ছন্নে যাবার মতো যথেষ্ট। নিজের বিশ্রামের কথা ভাবো।

প্রশান্তবাবু হাসলেন।—ওদের ওপর তোমার এত রাগ কেন। সুশান্ত চাকরি করবে কি করে, চাকরির নামেই আমার তো হৃৎকম্প হত। আর অনীতা তো বলেই দিয়েছে এম. এ পাশ করার পর বিয়ের কথা।

ইন্দিরা অখুশি মুখ করে জবাব দিলেন, জানি না বাপু, কারো মতিগতি বুঝি না।

ক'টা দিন ভেতরটা বেশ হালকা লাগছিল প্রশান্তবাবুর। মনের বিজ্ঞানীরা বলেন, নিজের ভেতর দেখা গেলে অনেক দুর্বোধ্য বা অগোচরের জট খুলে যায়, স্নায়ু শিথিল হয়, বশেও থাকে। প্রশান্তবাবুর সদ্য অনুভূতিও অনেকটা সেই গোছের। কিন্তু পরের ছ'সাত দিন আর ওই নোট বই খুলে বসার অবকাশ পেলেন না। ছেলেমেয়ে আর সপরিবারে শ্যালক এসেছে দিল্লি থেকে। ভগ্নিপতির অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর থেকেই আসতে চেষ্টা করছিল।

ছ'দিন বাদে তারা চলে যাবার পর এতবড় বাড়ি আবার খালি। বিকেলের দিকে ইন্দিরা কি কাজ সারতে বেরিয়েছেন। ছেলেমেয়েও বাড়ি নেই। প্রশান্তবাবু বারান্দার ইজিচেয়ারে। সামনের কাঠের টুলে সেই মোটা বাঁধানো নোট বই আর কলম। ওটা খুলে বসার জন্য ভেতরটা অনেকক্ষণ ধরে লালায়িত হয়ে উঠেছিল। এই রকম নিরিবিলি ফুরসতের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ভিতরের যে মানুষটা ওই হিজিবিজি চিন্তার মিছিলের নায়ক, আয়নায় দেখার মতো তাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কারণ প্রশান্তবাবুর মতো সেও এক পরিণতির মোহনার দিকে পা বাড়িয়েছে। তফাৎ শুধু, তার সত্তা সকলের দেখা সকলের জানা প্রশান্ত মিত্রর থেকে বরাবরকার মতো আজও বিচ্ছিন্ন। নোট বই খুলে প্রশান্তবাবু কলম নিয়ে ঝুঁকলেন।

"…হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।" কতক্ষণ আর কতটা এমনি নামের আশ্রয়ে একাগ্র হতে পারলে ভিতরটাকে নিরাসক্ত নির্লিপ্ত করা যায়? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ…। টেলিফোন।…হ্যালো। হ্যাঁ বুঝেছি। শুনুন জীবনবাবু, বই পেয়েছি। গুণে দেখেছি সমস্ত বইয়ে তিরিশটা ছাপার ভুল। আর আপনাকে বই দেব কিনা ভাবতে হবে। আপনার পাবলিসিটিও আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না। যাক, পুরো তিন এডিশনের টাকা পাঠিয়ে দিন। আচ্ছা।…হরে রাম হরে রাম…বই লেখাটা নেশা না টাকা রোজগার নেশা? একটার সঙ্গে আর একটা। তফাৎ করা যায় না। যেমন গোলাপ আর তার গন্ধ। তফাৎ করা যায় না। এই পৃথিবীতে আসা কেন? গাদা গাদা বই লিখতে? আর টাকা রোজগার করতে? ঠিক আছে, অনেক বই অনেক টাকা—তারপর কি? তারপরেও কিছু না থাকলে ভিতরটা আশ্রয় খোঁজে কেন? সেটা কেমন আশ্রয়? তার ঠিকানা কি? "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে…।" টেলিফোন। হ্যালো…না অনীতা বাড়ি নেই। জানি না। জানি না।…মেয়েটার চালচলন আবার অন্যরকম ঠেকছে। আবার কার সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল কে জানে। প্রায়ই এই গলার ফোন আসে। একবার ঘা খেয়েও মেয়েটার শিক্ষা হয়নি। বিকেলে বেরোয় রাত করে ফেরে। খুব বুদ্ধিমতী ভাবে নিজেকে। সকালের কাগজ খুলেই অঘটনের ছড়াছড়ি। সেভাবে কাগজ পড়ে না, সাবধান হওয়ার দরকারও ভাবেনা। অঘটনের বরাত যেন সব সময়েই অন্যদের ওদের নয়!…শুধু মেয়ে কেন, ছেলেটাও কোন্ রাস্তায় হাঁটছে ঠিক নেই। মেয়েদের ফোন তো লেগেই আছে। বাপ প্রেমের গল্প লেখে আর বাপের পয়সায় খেয়ে দেয়ে ছেলে প্রেম করে। মা সে-ভাবে বেঁকে না বসলে একবার তো কোন্ যাত্রা পার্টির মেয়ে এনে ঘরে ঢুকিয়েছিল প্রায়। যাক্গে, ভেবে আর কি হবে। যার যেমন অদৃষ্ট। "হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম…।" টেলিফোন। হ্যা-লো। হ্যাঁ

শর্মাজী বলুন। ছবি সুপারহীট শুনেছি। থ্যাঙ্ক ইউ, কিন্তু গল্পের পিছনে আপনি এভাবে লেগেছিলেন বলেই এতটা সাকসেস।···কোন্ গল্পটা? ও হ্যাঁ···না এখনো কনট্রাক্ট হয়নি, ফ্রী আছে। বেশ তো, কিন্তু এতবড় সাকসেসের পর নতুন গল্পে লেখকও একটু বাড়তি মর্যাদার আশা রাখে—হাঃ হাঃ হাঃ।···বাংলার সঙ্গে হিন্দীও কনট্রাক্ট হবে? ওয়াণ্ডার-ফুল। ঠিক আছে, একটা দিন দেখে সকালের দিকে চলে আসুন, নমস্কার নমস্কার।···বাংলা হিন্দী একসঙ্গে কনট্রাক্ট মানে খুব কম হলেও পঞ্চাশ হাজার টাকা। সাদা কালো আধাআধি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণের বাতাসটুকু বেশ মিষ্টি লাগছে। বাঃ! ভারী সুন্দর দেখতে তো মেয়েটা। ফর্সা লম্বা সুঠাম স্বাস্থ্য। মেয়েটা নয়, কারো ঘরের বউ হবে। রাস্তার অনেক জোড়া চোখ টেনে হেসে হেসে আর এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে।···ধেৎ! সুন্দর মেয়ে মিষ্টি মেয়ে দেখতে সকলেরই ভালো লাগে—ভালো কথা। কিন্তু তিরিশ বছর আগের চোখ দিয়ে দেখা কেন? ছিঃ! "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।······"

পরদিন সকালে বেশ হাসি হাসি মুখে ইন্দিরা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে একখানা 'এই বাংলা' মাসিক-পত্র। কাছে এসে ওটা খুলে প্রশান্ত-বাবুর সামনে ধরলেন। তাতে ছবিসহ অনন্য লেখক প্রশান্ত মিত্রর দ্রুত আরোগ্য সংবাদ। ফাঁকে ফাঁকে তাঁর প্রতিভার প্রশস্তি। বিশেষ করে তাঁর চরিত্র চিত্রণ আর বিশ্লেষণ ক্ষমতার ঢালাও প্রশংসা।

হাসি মুখে 'এই বাংলা' ইন্দিরাকে ফেরত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তবাবুর কি মনে হল। চট করে উঠে কালো নোট বই আর কলমটা নিয়ে পাশের লেখার ঘরে চলে গেলেন। ওতে কিছু লিখে আবার চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন।

ইন্দিরা অবাক একটু।—কি হল, এই থেকেই আবার নতুন কিছু প্লট মাথায় এসে গেল নাকি!

প্রশান্ত মিত্রর ঠোঁটের হাসিটুকু রহস্যের মতো। নোট বই যথাস্থানে

অর্থাৎ ডেস্কে রাখতে রাখতে জবাব দিলেন, ওই তেলের প্লট নিয়ে গপ্পো তো কত বারই লেখা হয়ে গেছে।

দিন কুড়ি বাদে নীল আকাশ থেকে আচমকা বাজ পড়ার মতোই ঘটে গেল ব্যাপারটা। লেখক প্রশান্ত মিত্র চিকিৎসার চার ঘণ্টাও সময় দিলেন না। ডাক্তাররা বললেন, ম্যাসিভ স্ট্রোক। বাংলা সাহিত্য জগতে নিখাদ শোকের ছায়া নেমে এলো। প্রশান্ত মিত্র নেই।

দিন যায়। একটা মাস গড়ালো। শোকের স্তব্ধতা থেকে ইন্দিরাকেও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে হল। এই নিয়ম।

ক'দিন ধরে টেলিভিশনের লোক এসে এসে ঘুরে যাচ্ছে। তাদের প্রস্তাব, প্রয়াত অনন্য লেখকের সাহিত্য জীবন আর ঘরের জীবন নিয়ে স্বয়ং ইন্দিরা মিত্র একটা প্রোগ্রাম করুন। এই প্রোগ্রাম শত সহস্র দর্শক শ্রোতার কাছে পরম সমাদরের জিনিস হবে।

কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় ইন্দিরা টিভির লোকের সঙ্গে দেখাই করেন নি। ছেলেমেয়ে অনুরোধ করেও ফিরে গেছে। আজ আবার এসেছে। সুশান্ত অনীতা দু'জনেই তাগিদ দিচ্ছে, নিচে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু আলাপ করো না মা, এই নিয়ে তিন দিন এলেন।

—বসতে বল্।

ইন্দিরা উঠলেন। পরনের শাড়িটা খুব পরিষ্কার নয়। বদলালেন। সেই মুহূর্তে স্বামীর সেই নোট বইটার কথা মনে হল তাঁর। চরিত্র চিত্রণের প্রসঙ্গে কি-ভাবে নক্সা কেটে স্বামী কি করতেন, দেখাবেন।

বার করলেন। শেষের দিকের ক'টা দিন কি আঁকিবুকি করেছেন দেখার জন্য ওটা খুললেন। তারপরেই অবাক একটু। আঁকিবুকি নয়, লেখা। বিছানায় বসে পড়তে লাগলেন। যত পড়ছেন ততো গম্ভীর।

একেবারে শেষের কটা লাইন—ওপরে তারিখ দেওয়া। "...মানুষের চরিত্র নিয়ে সমস্ত লেখক জীবন ধরে যে এ-ভাবে ভাঁওতা-বাজী করে গেলাম, নিজেই জানতাম না। যে লোক নিজের চরিত্রের ঠিকানা জানে না, হদিস জানে না, সেই লোক অনন্ত চরিত্রস্রষ্টা—এর থেকে হাসির ব্যাপার আর কি হতে পারে!"

ইন্দিরা নিষ্প্রাণ স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে আছেন। ছেলে আবার তাগিদ দিতে এলো, মা এলে না?

—না, চলে যেতে বল্।

মায়ের এই মুখ দেখে আর তাঁর হাতে এবার কালো নোট বই দেখে ছেলে স্মৃতির শোক ভাবল। বলল, তাহলে আর এক দিন আসতে বলি?

—কোনদিন না। আমার দ্বারা এ-সব হবে না বলে দে!

নোট বইটা হাতে নিয়ে ইন্দিরাই আগে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মস্ত বাড়ি, ছ'তিনখানা ঝকঝকে গাড়ি আর টাকা পয়সার ছড়া-ছড়ি—কিন্তু এমন পরিবারেও কি ঝগড়া-ঝাঁটি, খিটির-মিটির লেগেই থাকে না? অথচ স্বভাবে ছ'জনের একজনেও ঝগড়াটে নয়?

প্রশ্নটা আমাকে করেছিল বোম্বাইয়ের মাস্টার সাহেব।

বোম্বাইয়ের মাস্টার সাহেব বলতে সেখানকার লোক নয়। বাঙালী। পঁচিশ বছর বয়সে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টায় বম্বে চলে গেছল। বেশ শক্ত সমর্থ পুরুষের চেহারা ছিল তখন। বি-এ পাশ। বাপ দাদা কেরানি। ফলে কেরানিগিরির ওপর ঘেন্না। কলকাতার সিনেমা এলাকায় কিছুকাল ঘোরাঘুরি করেছে। আর এদিকে এক চৌকস হিন্দুস্থানী শিক্ষকের কাছ থেকে বেশ মন দিয়ে হিন্দী শিখেছে। তার জন্য পয়সা খরচ করতে হয়নি। তার আগ্রহ দেখে ভদ্রলোক নিজেই যত্ন করে শিখিয়েছে। হিন্দীর ছ'ছটো ডিপ্লোমা পরীক্ষায়ও ভালো পাশের সার্টিফিকেট তার ছাত্রের পকেটে এসেছে। মোট কথা, কলকাতায় সুবিধে হল না দেখে মাস্টার সাহেব (তখন নাম অমর ঘোষ) যখন বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিল, তখন সে টগবগ করে হিন্দী বলতে পারে, ইংরেজী বলতে পারে—বাংলা তো পারেই।

কিন্তু অর্থভাগ্যটা কোনদিনই তার সুবিধের নয়। বোম্বাইয়ের ছবির বাজারে তখন রাজপুত্র মার্কা হিরোর কদর। অনেক কষ্টেও ভদ্রলোক পাত্তাই পেল না। ছোটখাটো রোলে কিছু চান্স পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে তৃতীয়-চতুর্থ সারির আর্টিস্টদের কোন অস্তিত্বই নেই। নায়ক-নায়িকা ছেড়ে টেকনিসিয়ানদেরও তারা করুণার পাত্র। কিন্তু একজন মাঝারি প্রোডিউসারের চোখে তার যে গুণটি ধরা পড়েছিল সেটা অভিনয় নয়। সেই প্রযোজকটির নাম অজিত বরিসকর। তার একটি বুদ্ধিমান কর্মঠ বিশ্বস্ত লোকের দরকার ছিল। সে সোজাসুজি তাকে

বলেছিল, দেখ, অভিনয়-টভিনয় কোনোদিন তোমার দ্বারা হবে না। আমার এদিকের হিসেবপত্র রাখা,আর বাড়িতে তিনটি ছেলেকে পড়ানোর জন্য একজন ভালো লোক দরকার। এ-জন্যে মাস গেলে আমি তোমাকে তিনশো টাকা মাইনে দেব। থাকার জন্য আমার বাড়িতেই আলাদা ঘর পাবে—বিনে পয়সায় খাওয়া-দাওয়াও পাবে। সকালে ছেলে পড়াবে, দুপুরে স্টুডিওতে এসে আমার কাজকর্ম দেখবে। ছোটখাটো এক-আধটা রোল যদি পাও করবে—সেটা তোমার বাড়তি রোজগার।

মাস্টার সাহেব অর্থাৎ অমর ঘোষ এককথায় রাজি হয়ে গেছল। তার তখন রীতিমতো দৈন্যদশা চলেছে। যত্রতত্র খাওয়া আর যত্রতত্র শোয়া। আশা করেছিল বরিসকর সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতে পেলে একদিন তার অভিনয়েরও কদর হবে। তা আর হল না। সেই থেকে সে মাস্টার সাহেব। ছোট ভূমিকায় অভিনয়ে নামলেও পর্দায় নাম লেখা থাকে মাস্টার সাহেব। এতদিনে নিজের নাম নিজেই সে ভুলতে বসেছে, কারণ নাম বললে চেনা মহল বা স্টুডিও মহলের কেউ তাকে চিনবে না।

বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। ফর্সা কোনদিন ছিল না, গায়ের রঙে এখন আরো পোড় খেয়েছে। তবে এখনো সুশ্রী, আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। নিজের ভাগ্য নিয়ে আর কোন আক্ষেপ নেই। বরং বেশ হাসিমুখে কৌতুকরসে জারিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের গল্প করতে পারে। এখন এক স্টুডিও এলাকাতেই নামমাত্র ভাড়ায় একখানা ঘর নিয়ে আছে। সেই স্টুডিওর খাতা-পত্র দেখার চাকরি করে, মাইনে সর্বসাকুল্যে চারশো। বোম্বাই শহরে এ-টাকায় মাস চালাতে হলে প্রতিটি পয়সার হিসেব রেখে চলতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ বেজার মুখ দেখে না তার।

এই বয়সেও এত কম মাইনে। তার কারণ আছে। স্টুডিওর এই চাকরি খুব বেশি দিনের নয় তার। মাত্র দেড়-দু' বছরের। তাও আগে চেনা-জানা ছিল বলে স্টুডিওর মালিকরা দয়া করে তাকে এই কাজটুকু

দিয়েছে। চাপাচাপি করলে মাইনে আরো কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু মাস্টার সাহেব তা করে না। দিব্যি চলে যাচ্ছে। নিজে রেঁধে খায়, আর নেশার মধ্যে শুধু বিড়ির খরচ।

এখানকার চাকরির আগে মোটামুটি ভালভাবেই দিন কেটেছে তার। টানা বারো-তেরো বছর অজিত বরিসকরের কাছে বাড়ির লোকের মতোই ছিল। সেই ভদ্রলোকের ছোট ছেলেটাও সেকেণ্ডারি পাশ করে বেরিয়ে যাবার পর মাস্টার সাহেবের ডাক পড়েছে তার বড় মেয়ের বাড়িতে। বড় মেয়ের নাম শীলা। বিয়ের পর তিড়কে হয়েছে। মাস্টার সাহেব যখন বরিসকর বাড়ির বাসিন্দা, শীলার বয়েস তখন উনিশ-কুড়ি। আরো বছর দেড়েক বাদে দিলীপ তিড়কের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের পৈতৃক ব্যবসা। শীলাদের থেকেও বড় অবস্থা। মেয়ে পছন্দ হতেই তুলে নিয়ে গেছে। পছন্দ হবার মতো মেয়ে তো বটেই। কলেজে পড়ে, চেহারাপত্রের চটক খুব, কালো চোখের শরে পুরুষ ঘায়েল করার কেরামতি রাখে। বিয়ে হবে না কেন। বিয়ের একমাস বাদে দিলীপ তিড়কে লণ্ডন চলে গেছল বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট পড়তে। বছর দুই বাদে ধৈর্য খুইয়ে চলে এসেছে। শীলা ততদিনে এক ছেলের মা। বিয়ের ন' মাসের মধ্যেই তার ছেলে হয়েছে। ছেলের অন্নপ্রাশনের উৎসবে দিলীপ তিড়কে সাত দিনের জন্য এরোপ্লেনে চেপে চলে এসেছিল। ধুমধামের পর আবার ফিরে গেছে।

যাই হোক, দিলীপ তিড়কে ফিরে আসার দশ-বারো বছরের মধ্যে শীলার আরো দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে হয়েছে। তার বছর কয়েকের মধ্যে শীলার ছোট ভাইয়ের পড়া সাঙ্গ হতে বাপের কাছে আব্দার জানিয়ে মাস্টার সাহেবকে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছে। আর ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। শিক্ষক হিসেবে মাস্টার সাহেবের গুণ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ শীলার তিন-তিনটি সাদা-মাটা ভাই-ই দিব্যি ভালো রেজাল্ট করে বেরিয়ে এসেছে।

তিড়কের বাড়ি এসে মাস্টার সাহেবের দিন আরো ভালো কেটেছে। বাড়ির কর্ত্রী অর্থাৎ শীলা যাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, অন্যেরাও তাকে কিছুটা সমীহ করে চলবে বইকি। তার ওপর দিলীপ তিড়কে কিছুটা নির্বিলিক মানুষ। তারও গোঁ আছে বটে, কিন্তু না ঘাঁটালে সে কারো সাতে-পাঁচে নেই। মাস্টার সাহেবের মাইনে সর্ব-সাকুল্যে তখন সাড়ে সাতশো টাকা। শীলা দেয় সাড়ে চারশো, আর স্টুডিওর কাজের জন্য তার বাপ দেয় তিনশো। প্রায় সবটাই ব্যাঙ্কে জমা পড়ার কথা। খাওয়া-পরার খরচ এক পয়সাও নেই। কিন্তু দু দুটো বড়লোকের বাড়িতে থাকার ফলে মাস্টার সাহেবের একটু খারাপ অভ্যেস হয়ে গেছল। মদ খাওয়া ধরেছিল। এ-জিনিসটা দু'বাড়িতেই জল-ভাত ব্যাপার। আর সিগারেট খরচাও ছিল তখন। তখন তো আর বিড়ি ফুঁকত না। বছর দুই আগে বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ির মেজাজী কর্ত্রী শীলা তিড়কে হুট্ করে তাকে বিদায় করে দিতে বেশ ফাঁপরে পড়েছিল মাস্টার সাহেব। এ-রকম হবে বা হতে পারে ভাবেনি, কারণ তখনো তার ছোট ছেলের স্কুলের পড়া শেষ হতেই বেশ বাকি। আবার ততদিনে মাস্টার সাহেবের সিনেমার চাকরিও গেছে। শীলার বাবা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে ব্যবসায় যবনিকা পড়েছে। বাবার দেওয়া মাইনেটাও শীলা পুষিয়ে দিচ্ছিল মেয়েটার, এখন আর মেয়েটার নয়, মহিলাটির এমনিতে দরাজ মন, কিন্তু তার মেজাজ বোঝা ভার। মাস্টার সাহেবও কোনরকম আবেদন না জানিয়ে চলেই এসেছে। তারপর এই স্টুডিওর চাকরিটুকু জোটাতে পেরে নিশ্চিন্ত।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে এই স্টুডিওতেই গেল বছরে আলাপ আমার। নিজের গল্পের একটা ছবির কাজেই কিছুদিন ছিলাম। লোক-টিকে আমার ভালো লেগেছিল। আমার অঢেল সময়। তার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে তার হাতের রান্নাও খাইয়েছে আমাকে। তখনই নিজের জীবনের গল্প করেছে।

এবারেও ছবির কাজে আসা। আমাকে দেখে মাস্টার সাহেব ভারী

খুশি। তার সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানিয়েছিল। বলেছিল, আপনার মতো একজনের সঙ্গে আমার খাতির দেখলে এরাও আমাকে একটু অন্য চোখে দেখবে। সেটা সম্ভব হয়নি, কিন্তু আড্ডা দিতে তার ঘরে প্রায়ই-গেছি।

স্টুডিওতে বসেই আমার আগামী ছবির বাঙালী ডাইরেক্টরের সঙ্গে স্ক্রিপট নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অকারণ ঝগড়া আর বচসার ব্যাপারগুলো আমার পছন্দ হচ্ছিল না। মাস্টার সাহেব সেখানে চুপচাপ বসেছিল। শুনছিল। পরে তার ঘরে ধরে এনে চা খেতে খেতে প্রথমেই ওই প্রশ্ন। যথা, মস্ত বাড়ি, তু-তিন-খানা ঝকঝকে গাড়ি আর টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি—এমন পরিবারেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকারণ ঝগড়া-ঝাটি লেগে থাকতে পারে কিনা! অথচ, স্বভাবে তু'জনের একজনও ঝগড়াটে নয়।

আমি কৌতূহল বোধ করেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ-রকম দেখেছ?

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে মাস্টার সাহেব জবাব দিল, না দেখলে বলছি! অথচ আশ্চর্যভাবে এই ঝগড়া-ঝাটি, খিটির-মিটির একেবারে থেমে যেতেও দেখেছি।

তার চোখ-মুখের দিকে চেয়ে আমার কৌতূহল আরো বাড়ল। বললাম, ব্যাপারখানা বলো তো মাস্টার সাহেব—শুনি? সমস্ত জীবন তো মাস্টারি করে কাটালে, কোথায় দেখলে?

—এই মাস্টারি জীবনেই। গেলবারে দিলীপ তিড়কে আর শীলা তিড়কের ছেলেমেয়েদের পড়াতুম—সে গল্প করেছি তো?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—সেখানেই। দিলীপ আর শীলার মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ কি-যে তুমুল লেগে যেত, আপনি ভাবতেও পারবেন না। ছেলেমেয়েরা ছেড়ে দিলীপ তিড়কেও স্ত্রীর তিরিক্ষি মেজাজের হদিশ না পেয়ে প্রথমে হাঁ করে থাকত। পরে সে-ও ক্ষেপে যেত। আমার মাঝে মাঝে ভয় হত, এত-

গুলো ছেলেমেয়ে, কিন্তু এ-রকম অকারণে বা তুচ্ছ কারণে দু'জনের একটা ডিভোর্সের ব্যাপার না হয়ে যায়। এ-রকম বছরের পর বছর ধরে দেখেছি। তারপর মাত্র এই দু'বছর আগে সব ঠাণ্ডা—স্বামী-স্ত্রীতে বেশ সদ্ভাব।

মুখের দিকে চেয়ে মাস্টার সাহেব এমন টিপ টিপ হাসতে লাগল যে আমার মনে হল, গল্পের সবে শুরু। জিগ্যেস করলাম, বছরের পর বছর ধরে অত ঝগড়া কেন, আর পরে হঠাৎ সদ্ভাবই বা কেন—কেউ জানে না?

—শীলা তিড়কে নিশ্চয় জানে, আর দিলীপ তিড়কের হয়তো ধারণা কোন দৈব অনুগ্রহেই স্ত্রীর মন-মেজাজ ঘুরে গেছে। ···কিন্তু ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পারি বলেই শীলা তিড়কে হুট্ করে আমাকে জবাব দিয়ে বসল।

এরপর আমি শোনার জন্য উদগ্রীব। মাস্টার সাহেবও বলতেই চায়। সংক্ষেপে চিত্রটা এই রকম:

···শীলা তিড়কের এখন বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। কিন্তু এখনো দেখলে কেউ চল্লিশ ভাববে না। মাস্টার সাহেব লক্ষ্য করেছে তার মন-মেজাজ বিগড়তে শুরু করেছে বছর সাত-আট আগে থেকে। কারণে-অকারণে ক্ষেপে যায়। রাগ সব থেকে বেশি স্বামীর ওপর। সে বেচারা যতক্ষণ পারে সহ্য করে। তারপর সে ও পালটা ঝাপটা মারতে আসে। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো ভয়ে তটস্থ তখন। কারণ, ঝগড়ার পরের জেরটা প্রায়ই ওদের ওপর এসে পড়ে। রাগারাগির পর ওদের বাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর মা ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে পড়ে। তুচ্ছ কারণে মারধোরও করে। মাস্টার সাহেব বাধা দিতে চেষ্টা করলে তাকে সুদ্ধু চোখের আগুনে ভস্ম করতে চায়। এরই মধ্যে শীলা তিড়কের আবার ধর্মে মতি এসেছে কিছু। নিজের একটা ঠাকুর ঘরও করেছে কিন্তু ধর্মে মন দিলে সাধারণত মেজাজপত্র ঠাণ্ডা আর সুস্থির হতে দেখা যায়। শীলা তিড়কের ঠিক উল্টো। দিনে দিনে আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠছে।

এদিকে দিলীপ তিড়কে তার ব্যবসা নিয়ে সত্যি ব্যস্ত। ব্যবসার কাজে প্রায়ই তাকে বোম্বাইয়ের বাইরে বেরুতে হয়। বেশি যায় গোয়ায়। গোয়ার সঙ্গে কিছু আমদানি-রপ্তানির যোগ আছে। সেখানে তার এক খুড়তুতো ভাই ব্যবসার দেখাশুনা করত। বছর চারেক আগে সেই ভাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় দিলীপ তিড়কের আরো ঘন ঘন গোয়ায় যেতে হয়। অন্য দায়ও আছে। সেই খুড়তুতো ভাইয়ের তুটো ছেলে। ভাই মারা যাবার সময় একজনের বয়েস চার, আর একজনের দেড়। ওদের বা ওদের মায়ের তখন একমাত্র দিলীপ তিড়কে ছাড়া তিন কুলে আর কেউ নেই। পরের এই ক'টা বছরে সেই ভাইয়ের বউটি ব্যবসার কাজ মোটামুটি বুঝে নিয়েছিল। বম্বে টু গোয়া দূর কিছু নয়। দিলীপ তিড়কের সেই ভাই জীবিত থাকতেও শীলা কোনদিন তাদের বম্বে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য আপ্যায়ন করেনি। আশ্রিতদের সে আশ্রিতের চোখেই দেখে। সেই ভাই মারা যাবার পরেও তাদের ডাকেনি। মাস গেলে মাসোহারা যাচ্ছে, এর বেশি আর কি করার আছে? স্বামীকে সে-ই পরামর্শ দিয়েছিল,হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে তোমার ভাইয়ের বউকে ওখানকার ব্যবসার কাজ একটু আধটু বুঝে নিতে বলো—শুধু দয়ার ওপর কতকাল আর চলতে পারে। দিলীপ তিড়কে খুশি মুখে স্ত্রীর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল।

যাক,বাড়ির অশান্তি এদিকে বাড়ছেই—বাড়ছেই। শীলা তিড়কের উঠতে বসতে রাগ। স্বামী ঘরে থাকলে রাগ, ব্যবসার কাজে ব্যস্ততা বাড়লে রাগ, নিজে আর আর্চায়ও মন দিতে পারে না বলে রাগ। আগের মতো উৎসব-আনন্দে যোগ দিতে পারে না বলে রাগ, আবার পূজোআর্চায়ও মন দিতে পারে না বলে রাগ। এরই মধ্যে এই পরিবারে আবার একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিল। নিজের চার-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়েই অস্থির আর অসহিষ্ণু শীলা তিড়কে, তার মধ্যে বলা নেই, কওয়া নেই, হুট করে আরো তু-তুটো নাবালককে গোয়া থেকে বোম্বাইতে তুলে নিয়ে এলো দিলীপ তিড়কে।

ভদ্রলোক সত্যি নিরুপায়। কারণ, গোয়ার সেই ভাইয়ের বউও তিন দিনের অসুখে দুম করে মারা গেল। তার বড় ছেলেটার বয়েস তখন ন'য়ের কাছাকাছি, আর ছোটটার ছয়। ভারী মিষ্টি ছেলে দুটো। দেখলে মায়া হয়। আর বোঝা যায়, ওদের বাবা বা মায়ের দু'জনের একজন অন্তত ভারী রূপবান বা রূপসী ছিল। শীলা তিড়কে যে মেজাজের মহিলাই হোক, স্বামীকে খুব একটা দোষ দেবে কি করে। বাপ-মা মরা ছেলে দুটো যাবে কোথায়। অসন্তুষ্ট হলেও এ নিয়ে খুব একটা রাগারাগি করতে পারল না। দিলীপ তিড়কে আশ্বাস দিল, আর একটু বড় হলেই ছেলে দুটোকে হস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভদ্রলোকের বুকের তলায় বেশ একটা নরম জায়গা আছে বটে। স্ত্রীর ভয়ে বাইরে কোনরকম হাঁক-ডাক নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসহায় ছেলে দুটোর প্রতি সজাগ চোখ। চুপচাপ ওদের ভালো স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। মাস্টার সাহেবকে চুপি চুপি অনুরোধ করে ওদের দুজনের জন্য আলাদা একজন টিউটর রাখা হয়েছে। বড়ঘরের ছেলের মতোই ফিটফাট পোশাক-আসাক ওদেরও।

এরই মধ্যে মাস্টার সাহেব লক্ষ্য করছে, শীলা তিড়কে হঠাৎ কি-রকম গুম মেরে যাচ্ছে। তার চিৎকার চেঁচামিচি রাগারাগি কমে আসছে। সব দেখে লক্ষ্য করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। মাস্টার সাহেবের ভয়, খুব বড় রকমের কিছু বিস্ফোরণের লক্ষণ এটা।

মাস চারেক বাদে এক দুপুরে খোদ কর্ত্রীর শোবার ঘরে ডাক পড়ল মাস্টার সাহেবের। ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে। দিলীপ তিড়কে অফিসে। মাস্টার সাহেব পড়ার ঘরে বসে বই পড়ছিল। নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেল।

সেই থমথমে মুখ দেখেই প্রমাদ গুণছিল মাস্টার সাহেব।

শীলা খুব ঠাণ্ডা গলায় তাকে কিছু বলল, তারপর কিছু হুকুম করল। সেই হুকুম মতো সেই দুপুরেই মাস্টার সাহেব গোয়ায় চলে গেল। তার বুকের তলায় সর্বক্ষণ তখন হাতুড়ির ঘা। দুদিন বাদে

ফিরল। বুকের তলায় তখন এক ধরনের হিংস্র আনন্দ। এই পরিবার এখন তছনছ হয়ে যাবে—ওই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হয়তো আর কেউ রুখতে পারবে না।

ফিরেছেও দুপুরে। বাড়িতে যখন আর বিশেষ কেউ নেই। শীলা তিড়কে আবার তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা মুখে মাস্টার সাহেব তাকে সমাচার জানালো। তার সন্দেহ সবটাই সত্য। গোয়াতে দিলীপ তিড়কের কোনরকম ভাই বলে কেউ ছিল না। ওখানকার ব্যবসা দেখার দায়িত্ব নিয়ে একজন খুব রূপসী মহিলা নিযুক্ত ছিল। সেখানকার লোক জানে দিলীপ তিড়কে পরে তাকে বিয়ে করেছে। ছেলে দুটো তাদেরই।

এরপর শেষ দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল মাস্টার সাহেব। কিন্তু এমন শেষ দেখবে কল্পনাও করেনি। তাকে আবার একদিন চুপি চুপি ডেকে বলেছে, এ-খবর যেন প্রকাশ না হয়। আর পনের দিনের মধ্যে অন্য মূর্তি দেখেছে শীলা তিড়কের। সেই আগের মতো হাসি-খুশি, উচ্ছল স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে যায়, সিনেমায় যায়। বাড়ির ছটা ছেলেমেয়েকেই আদর করে, জিনিস কিনে দেয়, সমান চোখে দেখে।

মাস শেষ হতেই তিন হাজার টাকা মাস্টার সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, প্রাইভেট টিউটর আর দরকার নেই—সে আর মিস্টার তিড়কে ছেলেমেয়েদের অন্যভাবে মানুষ করার কথা ভাবছে। তারা দুজনেই মাস্টার সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই পর্যন্ত বলে মাস্টার সাহেব থামল। আমি বিমূঢ় মুখে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

ঘোরালো দু'চোখ মাস্টার সাহেব আমার মুখের ওপর তুলে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার বুঝলেন কিছু?

মাথা নাড়লাম। —না। একদিকে মহিলার এমন উদার পরিবর্তন, অন্যদিকে তোমার ওপর হঠাৎ বিরূপ কেন?

অনুচ্চ অথচ ক্ষোভ-ঝরা গলায় বিড় বিড় করে মাস্টার সাহেব জবাব

দিল, উদার পরিবর্তন না ছাই—সে নিজের এতকালের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেল। বিয়ের এক মাস বাদেই দিলীপ তিড়কে দুবছরের জন্য বিলেত চলে গেছল, আর ন'মাসের মধ্যে শীলার বড় ছেলে ঘরে এসেছে···সেই ছেলে দিলীপ তিড়কের নয়।

শুনে আমি হতভম্ব, বিমূঢ় খানিকক্ষণ। সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই জিগ্যেস করলাম, কিন্তু এ-রকম একটা ব্যাপার তুমি জানলে কি করে!

মাস্টার সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। গলার স্বরে চাপা বিরক্তি। জবাব না দিয়ে মন্তব্য করল, কি-যে ছাইয়ের গল্প লেখেন বুঝি না।

দাম্পত্য

ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হয় রমেনবাবুর। খাটুনির জীবনে এইটুকুই বিলাসিতা। আজ চোখ মেলে তাকিয়েই তাঁর মনে হল কোথায় যেন এই সকালটার একটু ব্যতিক্রম অনুভব করছেন। বিছানায় শুয়েই চারদিকে তাকালেন। সামনের ছোট টেবিলে ট্রে-তে বেড-টি পট আর পেয়ালা। গত পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি বেড-টি খেয়েছেন মনে পড়ে না। তার আগে অবশ্য ঘুম চোখে এক পেয়ালা চা কোনরকমে গলাধঃকরণ করে আবার শুয়ে পড়তেন। চোখমেলে ভালো করে তাকাতেনও না। সুমিত্রার তাগিদে উঠছি উঠছি করে মাথার ওপরের পাখার হাওয়ায় চা কিছুটা ঠাণ্ডা হলে দু'চুমুকে পেয়ালা শেষ করে আবার শুয়ে পড়তেন। চা সমস্তদিনে রমেন চৌধুরী অনেক-বার খান। কিন্তু ওই সাত সকালে সুমিত্রার ডাকে চা গেলানোটা বিরক্তিকর লাগত। না খেলে, সেও যেন কালচারের হানি। রমেনবাবু অবশ্য কখনো এ নিয়ে আপত্তি করেননি। আজ থেকে বাইশ বছর আগে সুমিত্রা এ বাড়িতে পা-দিয়ে যা-কিছু করেছেন তার সব কিছুই তখন রমেনবাবু অম্লানবদনে মেনে নিয়েছেন। তাই পরে আর আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

কিন্তু পাঁচ মাস বাদে রঘু ব্যাটা ভুল করে আবার চায়ের ট্রে রেখে গেছে বোধহয়। পরক্ষণে নিজের গায়ের পাতলা চাদরটার দিকে চোখ গেল। ভোরের দিকে এখন সামান্য ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পড়ে। তার মধ্যে মাথার ওপর পুরো দমে পাখা ঘোরে। ভোর রাতে বেশ শীত করছিল রমেনবাবুর মনে আছে। কিন্তু ঘুম চোখে পায়ের তলার চাদরটা আর খুঁজে পাননি তিনি।

রঘুটা সেদিন চাদর দিতে ভুলেছে ভেবে কুঁকড়ে শুয়ে ছিলেন আবার। কিন্তু এখন নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা।

দেখছেন। ঘুমের মধ্যে আবার কখন উঠে চাদর হাতড়ে পেয়েছেন এবং গায়ে দিয়েছেন মনে করতে পারছেন না।

আরো অবাক সামনের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তে। রঘু ভুল করে না হয় বেড-টি রেখে গেল, কিন্তু দরজা ছুটোও খোলা রেখে গেল! তাছাড়া তাঁর ঘুমের মধ্যেই দরজায় পাট-ভাঙ্গা নতুন পর্দা লাগিয়ে দিয়ে গেল? ও-রকম মুগো রঙ্গের পর্দাগুলো সব সুমিত্রা নিয়েই গেছে ধরে নিয়েছিলেন। কারণ গত পাঁচ মাসের মধ্যে মাঝে একবার মাত্র এই ঘরের পর্দা বদলানো হয়েছে মনে পড়ছে। তাও রঘু নিজের পছন্দ মতো ভারী একটা নীল পর্দা এনে লাগিয়েছিল। গত তিন মাস ধরে সেই পর্দাই ঝুলছিল। কি ভেবে বালিশের ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে পিছনের জানলা ছুটোর দিকে তাকালেন রমেনবাবু। তার পরেই হাঁ একেবারে। দরজায় ওই মুগো পর্দা লাগালেই তার সঙ্গে ম্যাচ করে জানলায় ওই রংয়ের পর্দাই টাঙাতো সুমিত্রা। এখনো জানলায় সেই ম্যাচ করা ঝক্‌ঝকে পর্দাই দেখছেন রমেনবাবু। তিনি ঘুমুচ্ছেন আর সেই ঘরে ঢুকে রঘু নিঃশব্দে এত সব করে গেল দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

আস্তে আস্তে শয্যায় উঠে বসলেন তিনি। ঘরের চার দিকে ভালো করে তাকালেন আবার। ড্রেসিং টেবিলটা সাজানো, কোণের আলনাটা গোছানো। পাঁচ মাস আগে যেমন থাকত, সে রকমই অনেকটা।

ঘড়ি দেখলেন। ন'টা বাজে প্রায়। এত বেলা পর্যন্ত আগে ঘুমোতেন না তা বলে। ইদানীং বেলা হচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়েন, বা জার্নাল-টার্নাল পড়েন। রাতের ঘুম কমেছে, ফলে সকালের ঘুম বেড়েছে।

—বাবা এখনো ওঠেনি রে রঘু?

বাইরে থেকে এই গলার শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা যেন ধপধপ করে লাফিয়ে উঠল রমেনবাবুর। একি শুনলেন

তিনি? কার গলা শুনলেন? এখন তিনি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন?

ওই গলার স্বর যার, সে পর্দা ঠেলে গলা বাড়ালো। তাঁকে বসে থাকতে দেখে মুখে হাসি ভাঙল। তু'চোখ আনন্দে চক্‌চক্‌ করছে।

সুমু। সৌমেন, রমেনবাবুর একমাত্র ছেলে। কুড়ি বছর বয়েস। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে একমুখ হেসে বাবাকে প্রণাম করল। বলল, খুব অবাক করে দিয়েছি তো? মা একটা চিঠি লিখে তোমাকে জানাতে বলেছিল আমরা আসছি। আমি বলেছি, না, যাচ্ছি যখন না জানিয়েই যাবো। বাবাকে অবাক করে দেব।

ছেলেকে তুহাতে জড়িয়ে ধরলেন রমেনবাবু। বুকে চেপে ধরলেন। তারপর কি যে হয়ে গেল, নিজেও অপ্রস্তুত। যা কখনো হয়নি তাই হয়ে গেল। কেঁদে ফেললেন তিনি।

বাবার চোখে জল দেখে ছেলেটাও অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি বলল, তুমি আর কিছু ভেব না বাবা। সব ঠিক হয়ে গেছে। মা আর তোমাকে ছেড়ে যাবে না, আমিও না। কি যে এক মজার কাণ্ড হয়েছে না মাদ্রাজে—একদিনে মায়ের মেজাজ জল—মনই ঘুরে গেল একেবারে, বলব'খন তোমাকে—চুপ মেরে যেতে হল। পর্দা সরিয়ে সুমিত্রা ঘরে ঢুকলেন। বাপে-ছেলেতে তখনো জড়াজড়ি, আর রমেনবাবুর চোখে তখনো জল।

তাড়াতাড়ি ছেলেকে ছেড়ে দিলেন। নিজের ওপরে হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হল রমেনবাবুর। এই একজনের কাছে চোখের জলসুদ্ধু ধরা পড়তে চাননি।

সুমিত্রা চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। সুমুও এই ফাঁকে মা-কে দেখে নিচ্ছে।

সুমিত্রা স্নান সেরে এসেছেন। ভেজা চুল। ফর্সা মুখে ফোঁটা ফোঁটা জলের দাগ। আয়নার দিকে চলে গেলেন। ড্রয়ার খুলে চিরুণি বার করলেন।

পাঁচ মাস বাদে দেখা হবার পরে ঘরের তিনজনেই একেবারে চুপ মেরে গেলো অস্বস্তিতে। ছেলে একবার মাকে দেখে নিয়ে অনেকটা বেপরোয়ার মতো বলে ফেলল, তোমাকে প্রথমেই একটা সুখবর দিয়ে রাখি বাবা। এবার থেকে আমি তোমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্টরির কাজে লেগে যাবো। তোমার কাছে হাতে কলমে কাজ শিখবো।

এ-কথা শুনে রমেনবাবুই যেন ফাঁপরে পড়লেন। তাড়াতাড়ি বললেন, না—না, ও-সব তোকে করতে হবে না।

সুমিত্রা মোটা চিরুণি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। অনেক চুল। সেই চুলে চিরুণি সুদ্ধু হাত থেমে গেল। সামান্য মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

রমেনবাবু ছেলেকে বললেন, মা যা বলবেন তাই করবি।

বা—রে। মা-ই তো ওই কথা বলেছে, তোমার সঙ্গে কাজ করব। তোমার কাছে কাজ শিখব—

রমেনবাবু আবারও হতচকিত একটু। এতো বিশ্বাস করতে হবে!

সুমিত্রার হাতে আবার চিরুণি চলছে। আয়নার দিকে মুখ। ছেলেকে বললেন, রঘুকে ওই চায়ের ট্রে নিয়ে যেতে বল্, চা-জল খাবার সব একেবারে নিয়ে আসুক, গল্প করতে হয় মুখ হাত ধোয়া হলে তারপর কর্, সকাল ন'টা বেজে গেল—

পরোক্ষ শেষের উক্তিটা রমেনবাবুর উদ্দেশ্যে সেটা ছেলেও বুঝল। খাট ছেড়ে মায়ের নির্দেশ পালন করতে চলল সে।

সুমিত্রা ধীরে সুস্থে মাথা আঁচড়াচ্ছেন। অত চুলের জন্য শরীরের ওপরের দিকটা একটু বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। লোভীর মতোই দেখতে ইচ্ছে করছে রমেনবাবুর। আগে তাই দেখতেন। আয়নার ভিতর দিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে এলেন। যেন তাড়া আছে এমনি ভাব করে মুখ হাত ধুতে চলে গেলেন।

হঠাৎ কি হল বা হতে পারে মাথায় ঢুকছে না। এই ছেলেকে অর্থাৎ সৌমেনকে নিয়েই মর্মান্তিক বিচ্ছেদ সুমিত্রার সঙ্গে। এবারে কোর্টে—

নিষ্পত্তি হবার কথা। শ্বশুরের শেষ কড়া চিঠিতে এ-রকম আভাসই পেয়েছিলেন তিনি। আর গোঁ ধরে সেই অবাঞ্ছিত পরিণামের অপেক্ষাতে ছিলেন। তার মধ্যে ছেলে নিয়ে সুমিত্রা হঠাৎ ফিরে আসবে এ তিনি ভাববেন কি করে? শুধু তাই নয়, সুমু বাপের কাছে কাজ শিখবে, বাপের সঙ্গে কাজ করবে—সুমিত্রাই নাকি এ-কথা বলেছে। এ কানে শুনলেও সত্যিই বিশ্বাস করেন কি করে?

তোয়ালেতে মুখ মুছে আবার ঘরে ফিরলেন রমেনবাবু। মাথা আঁচড়ানো শেষ করে সুমিত্রা মনযোগ দিয়ে কপালে সিঁদুরের লাল শিখা দিচ্ছে দেখলেন রমেনবাবু। রঘু চা আর সকালের খাবার রেখে গেছে। আয়নায় আবার চোখাচোখি হতে রমেনবাবু মুখ ফিরিয়ে পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন।

—আগে টোস্ট আর পোচ খাও তারপর চা ঢালবে।

আগে যে মেজাজে কথা বলত সুমিত্রা তার খুব একটা রকমফের হয় নি। হাব-ভাব আচরণও বদলায়নি। তবু এরই মধ্যে কোথায় যেন একটু ভিন্ন স্বাদ পাচ্ছেন রমেন চৌধুরী। টোস্ট আর ডিমের পোচ টেনে নিলেন। সুমিত্রা সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে রমেনবাবু হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। আজ অনেক কাল বাদে টোস্ট আর পোচের থেকে হঠাৎ এই মুখখানা ঢের বেশী লোভনীয় লাগল তার। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে বেশী তাকাতেও পারছেন না।

এই পাঁচ মাসে চেহারার তো বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।

সুমিত্রার গলায় একটু শ্লেষের আভাস আছে কি নেই ঠিক ধরতে পারলেন না। সহজ হবার চেষ্টায় একটু হাসলেন রমেনবাবু।—কেন, খারাপ দেখছ?

—রঘু বলল, সকালে তিন চার পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছু খেতে না। রাতেও ছুটোর আগে ঘরের আলো নিভত না। শরীর খারাপ হবে না তো কি ভালো হবে?

রঘু ব্যাটা এইভাবে তাঁকে ডুবিয়েছে! 'কিন্তু চেষ্টা করেও তিনি

ঘুর উপর রাগ করতে পারলেন না। পারলেন না কারণ, সুমিত্রার সেই চিরাচরিত কর্তৃত্ব আর ব্যক্তিত্বের ফাটল দিয়ে আজ তিনি ভিন্ন রকমের কিছু দেখতে পাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন ছিলে?

—কেমন ছিলাম পাঁচ মাসের মধ্যে একটা চিঠি লিখে তো খবর নিতে পারতে? না কি ভেবেছিলে, দূর হয়েছে ভালই হয়েছে?

জবাবে রমেন চৌধুরী বলতে পারতেন, তিনি চিঠি লেখার জন্যে প্রস্তুত হবার আগেই শ্বশুরের দু দু'খানা কড়া চিঠি পেয়েছেন। একটাতে তাঁর উপদেশ ছিল, নিজে এসে মেয়ের কাছে মাপ চেয়ে তাকে যেন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। মাস দেড়েক প্রতীক্ষার পরে শ্বশুর দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি এবং সুমিত্রা দু'জনেই ডিভোর্স সুট ফাইল করার কথা ভাবছেন। আশা করা করা হচ্ছে এ নিয়ে সে (অর্থাৎ রমেন চৌধুরী) বেশী তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা করবে না। এবং সৌমেনের ভবিষ্যতের যথাযথ ব্যবস্থাও তার বাবা বিনা জোরজুলুমেই করবেন।

এই দ্বিতীয় চিঠির জবাব রমেন চৌধুরী শ্বশুরকে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, সৌমেন সাবালক, সে ইচ্ছে করলে তার বাবার কাছে থাকতে পারে, ইচ্ছে করলে মায়ের কাছে থাকতে পারে। আইনগত ভাবে তার প্রতি আর কোন দায়িত্ব রমেনবাবুর নেই। তবে ছেলে যদি তার বাবার কাছে থাকা সাব্যস্ত করে, তার ভবিষ্যৎ চিন্তাও তিনিই করবেন।

এ সব কথা মনে এলেও আজকের এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে তা বলা যায় না। টোস্ট চিবুতে চিবুতে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে একটু ঠাট্টাই করলেন রমেনবাবু। বললেন, এ-বয়সে স্ত্রী দূর হয়ে গেলে আর ভালোটা কি হতে পারে?

এইটুকুতেই সেই চিরাচরিত অসহিষ্ণুতা সুমিত্রার। থাক, পয়সার গরম হলে ষাট বছর বয়েসটাকেও তোমরা খুব একটা বয়েস ভাব না—বুঝলে?

রমেন চৌধুরী হাসছেন।—আমার ছে'চল্লিশ……এটা কি তাহলে পুরো যৌবন?

সুমিত্রা চোখের কোণে মানুষটাকে আর একবার দেখে নিলেন সকালে যখন পাখার হাওয়ায় কুঁকড়ে অঘোড়ে ঘুমোচ্ছিল তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। নিরীহ ঘুমন্ত মানুষটার দিকে চেয়ে তখনো একটা জোরের দিক আবিষ্কার করছিলেন তিনি। এখনো সেই জোরের দিকটাই দেখছেন। একটুও রাগ হচ্ছে না, বরং ভালো লাগছে। এই ভালো লাগার স্বাদটা আশ্চর্য রকমের নতুন। হঠাৎ হাসলেন সুমিত্রা একটু। বললেন, যাক শোন, সুমু ঠিকই বলেছে এখন থেকে সে তোমার সঙ্গে কাজে বেরুবে।

শুনে রমেনবাবুই হাঁসফাঁস করে উঠলেন। সুমিত্রা ফিরেই যখন এসেছে এ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আর ঘোঁট পাকাতে চান না। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, না-না, ও তুমি যা চাও তাই হবে। সুমু চার্টার্ড অ্যাকাউনটেনসিই পড়ুক, দেখে শুনে ভালো একটা ফার্মে ভর্তি হয়ে যাক, তারপর টাকা খরচ করলে গাইড করার লোকও ঠিকই পাওয়া যাবে।

সুমিত্রার চোখদুটো এমনিতেই বড়। মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকলে আরো বড় দেখায়। তেমনি চেয়ে রইলেন কয়েক পলক বললেন, কিন্তু আমি এখন আর তা চাই না—যা চাই তাই তোমাকে বললাম। কাল থেকেই ও তোমার সঙ্গে কাজে বেরুবে।

উঠে চলে গেলেন। রমেনবাবুর ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখ। না সুমিত্রার এ-রকম পরিবর্তনের জন্য তিনি কোনো ঠাকুর দেবতার দোরে ধর্ণা দেননি। তবু এ কি করে সম্ভব হল ভেবে পাচ্ছেন না। সুমিত্রা যে রাগ করে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বাতিল করে এ-ভাবে ফিরে এসে আত্মসমর্পণ করল, রমেনবাবুর সে রকমও মনে হচ্ছে না। তার নিজের ইচ্ছেটাই সব। সে কোনরকম আপোসের ধার ধারে না।

অথচ এই সুমু আর সুমুর ভবিষ্যত নিয়েই পাঁচ মাস আগের সেই

চরম ব্যাপার। অবশ্য এর আগেও স্বামী-স্ত্রীতে অনেক ঝগড়া হয়েছে। আর সুমিত্রা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। ঝগড়া বলতে যে গোছের বাক্‌বিতণ্ডা বা বচসা বোঝায় তা নয়। সেভাবে কথা কাটাকাটি করতে সুমিত্রার রুচিতে বাধে। আর রমেনবাবুও সবসময় কটকট করার মানুষ নন। যতক্ষণ সম্ভব সহ্য করেন, আর চুপচাপ দেখে যান বা শুনে যান। তারপর নিতান্ত অসহ্য হলে দুমদাম দু-পাঁচ কথা বলে বসেন। সুমিত্রা তখন এমনভাবে চেয়ে থাকেন যে তার সামনে কোনো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে না ইতরজন, তাই যেন সন্দেহ। তাই দেখে রমেনবাবুর মেজাজ এক-একসময় দ্বিগুণ বিগড়োতো। তখন মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়েই যেত। ও রকম অশালীনতার একটাই জবাব। সুমিত্রার বাপের বাড়ি প্রস্থান। এরপর রমেনবাবু প্রথমে ছেলেকে পাঠাতেন, তারপরে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করতেন। শেষে মুখ কাঁচুমাচু করে নিজেই শ্বশুরবাড়ির দিকে পা বাড়াতেন।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সর্বদাই তাঁদের মেয়ের পক্ষে। শাশুড়ী ঠারেঠোরে কিছু মন্তব্য করেন, শ্বশুর গম্ভীর মুখে দুই একটা জ্ঞানের কথা শুনিয়েছেন। বড়শালা বা শালার বউও দুই-একটা বিদ্রূপাত্মক কথা শোনাতে ছাড়েন না। তখনও ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকেন রমেনবাবু। কিন্তু তখন তার কানে তুলো, পিঠে কুলো। তবু নিজে গেলেই যে, সুমিত্রাকে আনা যেত এমন নয়। তবে তাতে কাজ হত। রাগের মাত্রা অনুযায়ী একদিন বা দুদিন বা পাঁচদিন বাদে সুমিত্রা ফিরে আসতেন।

রমেনবাবুর মতো ঠাণ্ডা মানুষের হঠাৎ-হঠাৎ ধৈর্য্যের বাঁধ কেন ভাঙে, সুমিত্রা সেটা কখনো বোঝেননি বা বুঝতে চেষ্টা করেননি। তার কারণ রমেন চৌধুরী নামে এক সাধারণ কনট্রাকটারের জীবনে তিনি দয়া করে পদার্পণ করেছেন এবং নিজের মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন।

সুমিত্রার বাবা এক মস্ত এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

এবং চার আনার মালিক। বড় অবস্থা। তেমনি চালচলন। আর রমেনবাবুর বাবা ছিলেন ওভারসিয়ার। নিজের উদ্যমে কনট্রাকটরি ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন তিনি। বিশ্বস্ত মানুষ। সুমিত্রার বাবা তাঁকে পছন্দ করতেন। অনেক কাজও দিতেন। বি. এ পাশ করে রমেনবাবু আর চাকরির চেষ্টায় না গিয়ে বাপের ব্যবসায়ে লেগে গেছলেন, আর নিজের সততা আর পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনিও সুমিত্রার বাবার সুনজরে এসে গেছলেন। বছর দুই আড়াইয়ের মধ্যে রমেনবাবুর বাবা মারা গেলেন। আর সত্যিকথা বলতে কি, সুমিত্রার বাবা তখন ওই উদ্যোগী ছেলেটা অর্থাৎ রমেনবাবুর প্রতি একটু বেশী উদার হয়েছিলেন। কর্মঠ, বুদ্ধিমান ছেলে। কাছে ডেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। কাজও আগের থেকে আরও বেশীই দিয়েছেন ক্রমশঃ। আর, তার ফলাফল দেখে খুশীই হয়েছেন।

—রমেনবাবুর তখন পঁচিশ বছর বয়েস। একটা চাপা প্রলোভন দুর্বার হয়ে উঠল। কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়লেন। অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের একমাত্র মেয়ে সুমিত্রাকে একখানা চিঠি লিখে বসলেন। তার চার বছর আগে থেকে এ বাড়িতে আনাগোনা। ওই মেয়েকে অনেকবার দেখেছেন। খুব যে রূপসী তা নয়। সুখের ঘরে ওটুকু রূপ অনেক মেয়েরই থাকে। কিন্তু তাঁকে দেখে দেখে রমেন চৌধুরীর পাগল হওয়ার দাখিল। সুমিত্রার তখন সবে উনিশ। কলেজে পড়ছেন। তাঁর দাদা বিলেতে। সেখানে তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। ভাবতে গেলে এই লোভ আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর সামিল। কোন যুক্তির দিকে না গিয়ে দীর্ঘ দিনের একটা যন্ত্রণার অবসান করে দেবার সংকল্পে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

—চিঠিতে চার বছরের স্বপ্ন আর সেই দুঃসহ যন্ত্রণার কথাই লিখেছিলেন। আর লিখেছিলেন, যদি এতটুকু আশা পান তাহলে মৃত্যু পণ করেও তিনি সুমিত্রার যোগ্য হয়ে উঠতে চেষ্টা করবেন।

স্বাস্থ্যবান সুঠাম এবং সুশ্রী লোকটাকে চোখের কোণ দিয়ে

সুমিত্রাও বহুবারই দেখেছেন। ও-রকম করে দেখা আর নিজেকে যাচাই করারই বয়েস সেটা। কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্তই। বাবার আশ্রিত-জনের প্রতি এতটুকু তুর্বল চিন্তার প্রশ্রয় ছিল না। তাই চিঠি পেয়ে সুমিত্রা প্রথমে স্তম্ভিত। এ তুঃসাহস ছাড়া আর কি? চিঠিটা বাবাকে দেখিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার ইচ্ছে। কিন্তু লোকটার মুখখানা মনে পড়তে তখনকার মতো ইচ্ছেটা বাতিল করলেন। কেন যেন একটা গুরুতর শাস্তি মাথায় চাপিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না। দরকার হলে ধৃষ্টতার জবাব নিজেই দিতে পারবেন। তাছাড়া বাবাকে যখন খুশী বলা যেতে পারে।

সেই বিকেলেই লোকটার দেখা পেলেন। তার খানিক আগেই বাবা বেরিয়েছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে সুমিত্রা ভুরু কোঁচকালেন। তারপর হন-হন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। কাকে দরকার। বাবাকে না আমাকে?

—উনিতো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন দেখলাম। আমতা আমতা জবাব।

ঘুরিয়ে বলা হল তাঁকেই দরকার।

সুমিত্রার গলার স্বর এবারে ঝাঁঝালো।—চিঠির জবাব চাই?

—পেলে নিশ্চিন্ত হতাম।

—তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। বাবা ফিরলে চিঠি তাঁর হাতে যাবে। তিনিই জবাব দেবেন।

রমেন চৌধুরী চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। ভীত চাউনি নয়। বিমর্ষ। বললেন, তাতে আর লাভ কি। চিঠি পড়ে তিনি গলা ধাক্কা দেবেন, আর, তুমি না চাইলে আমি বরাবরকার মতো চলে যাবো। তোমার কাছ থেকে এটুকু সম্মান অন্তত তুষ্প্রাপ্য ভাবি নি।

—তুমি! তোমার! সত্যিকারের ঝলসেই উঠেছিলেন সুমিত্রা।

বিব্রত মুখে রমেন চৌধুরী বলেছিলেন, খুব অন্যায় হয়েছে।........

নিজের মনে 'তুমি' 'তুমি' করে চার বছর এত কথা বলেছি যে ওটা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এ কথা শুনে ওই মুখ দেখে কেন যেন সুমিত্রা সে রকম জোরের সঙ্গে রাগ করে উঠতে পারেন নি। তবু, তাঁর গলায় ব্যঙ্গ ঝরেছে। নিজেও তুমি করেই বলেছেন।—তাহলে তুমি আশা করছ, জবাবটা আমিই দিয়ে তোমাকে একটু সম্মানিত করব ?

—হ্যাঁ।

—আর জবাব পেলে তুমি নিজে থেকেই বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে ?

—তা না গেলে নিজের আত্মসম্মানে লাগবে।

—আর সেই জবাবটা যদি অত হৃদয়বিদারক না হয় তাহলে বাবার অনুগ্রহে থেকে আমার যোগ্য হতে চেষ্টা করবে ? সুমিত্রার গলার স্বর একটুও নরম নয়।

—তাঁর অনুগ্রহ ছাড়াই চেষ্টা করব। রমেন চৌধুরীর শান্ত জবাব।

সুমিত্রার এবারে একটু মজাই লাগল।—বেশ, বাবার অনুগ্রহ ছাড়া যোগ্য হতে পারলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে কত বছর লাগবে ?

—ভরসা পেলে ছু'বছরের বেশী লাগবে বলে মনে হয় না।···আমার বাবার একটা জমি কেনাই ছিল। ছু'বছরের মধ্যে সেখানে তোমার পছন্দ মতো একটা বাড়ি তুলতে পারলে যোগ্যতার পরীক্ষায় তোমার যদি পাস নম্বর দিতে আপত্তি না হয় তাহলে গড়গড় করে আরো বড় পরীক্ষায় উতরে যাওয়া কঠিন হবে না।

প্রস্তাবে বৈচিত্র্য ছিল। মানুষটার জোরের দিক যাচাই করার লোভও হয়েছিল। সুমিত্রা কথা দিয়েছিলেন, ছু'বছর অপেক্ষা করবেন।

···শ্বশুরবাড়ির আদব কায়দার সঙ্গে কোনদিনও নিজেকে মেলানো সম্ভব হয়নি রমেন চৌধুরীর। এই রকম অসমবিয়েতে সুমিত্রার বাবা-মায়ের এবং বিলেত ফেরৎ এঞ্জিনিয়র দাদার একটুও সায় ছিল না।

কিন্তু আদব-কায়দা ভুলে কালচারড মেয়ের সিদ্ধান্তও সরাসরি কেউ বাতিল করে দেননি। সুমিত্রা বিজয়ীর গলায় মালা যেমন দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে বাপের বাড়ির আভিজাত্যের ছটাও তেমনি পুরোপুরি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এদিক থেকে স্বামীটিকে উপযুক্ত করে তোলা যেন একটা বড় দায়িত্ব তাঁর। গোড়ায় গোড়ায় মজাই পেতেন রমেনবাবু। পরে সন্তর্পণে শ্বশুরবাড়ির সংশ্রব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতেন। নিরলস প্রবল কর্মী পুরুষ তিনি, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির অন্য সকলের কথা বাদ দিয়ে সুমিত্রারও এজন্যে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে মনে হত না। সুমিত্রার যা কিছু পরামর্শ সব তাঁর বাবা মা দাদার সঙ্গে।

রমেনবাবু সহজে কিছু বলতেন না! আর যদি কখনো কিছু বলেন, সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে রাস টেনে ধরতেন।—তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

এই থেকেই বিরোধের সূচনা ক্রমশঃ। বছর না ঘুরতেই কোলে ছেলে এলো, সুমিত্রার চোখে এও যেন মেহনতী মানুষের বিবেচনার অভাব। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আর ছেলেপুলে নয়। এই লোকের প্রতি নির্ভর করতে না পেরে নিজেই তিনি সাবধান হয়েছেন। আর এই এক ছেলে সুমুও বড় হতে থাকল তাঁর মায়ের আর মামা বাড়ির হেপাজতে থেকে। এ ব্যাপারেও রমেনবাবুর বক্তব্য বা বিবেচনা কেউ গায়ে মাখেন না।

কিন্তু ওপরওয়ালা শোধ নিচ্ছেন। ছেলেটা বাপের নেওটা, বাপের কাছে আসতে পেলে মা বা মামার বাড়ির দিকে ঘেঁষতে চায় না। দু'-দুটো মাস্টার রাখা সত্ত্বেও স্কুলের পরীক্ষায় কোনদিন প্রথম দশজনের মধ্যেও তার নাম দেখা যায় না। মা শাসন করতে গেলে ছেলে বাপের কাছে পালায়। ওকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বেড়েই চলে। বাপ ছুটির দিনে বাগানের কাজে হাত দিলে ছেলে সোৎসাহে কোদাল দিয়ে মাটি কোপায়, জল নিকাশের নালা তৈরি করে। আর তাই দেখে মায়ের হাড়পিত্তি জ্বলে। সুমিত্রার মনের তলায় সব থেকে বড়

আশঙ্কা, ছেলেটা বাপের মতো হয়ে উঠছে। এই আশঙ্কা চাপাও থাকে না সব সময়। তখন স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া অনিবার্য।

এঞ্জিনিয়র দাতুর ইচ্ছে ছিল নাতি মস্ত ডাক্তার হোক। আর এঞ্জিনিয়র মামার ইচ্ছে ভাগনে বড় এঞ্জিনিয়রই হোক। কিন্তু দু'ছুটো বাছাই করা মাস্টার রাখা সত্ত্বেও সুমু সকলের আশায় ছাই দিয়ে হায়ারসেকেণ্ডারিতে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করে বসল। এর ফলে সুমিত্রার যত রাগ গিয়ে পড়ল ছেলের বাপের ওপর। আর বাপ বলল যা হয়েছে—হয়েছে, কত ছেলে তো থার্ড ডিভিসনে পাস করে।

এই নিয়ে শেষে তুমুল বির্তক আর তারপর সুমিত্রার রাগ করে বাপের বাড়ি প্রস্থান। ইদানীং এই রাগারাগি আর প্রস্থান একটু ঘন-ঘনই হচ্ছিল।

বাবা আর ভাইয়ের পরামর্শে সুমিত্রা এরপর ছেলেকে বি. এসসি অনার্স পড়ালো। উদ্দেশ্য, এতেও ভাল ফল হলে ডাক্তার অথবা এঞ্জিনিয়ার কিছু একটা হওয়া সম্ভব। অনেক টাকা মাইনে গুনে গোড়া থেকে দু'জন প্রোফেসার রাখা হল। পড়াশোনার ব্যাপারে সুমিত্রা এবার ছেলের ওপরেও নির্মম। কিন্তু বি. এসসির ফল বেরুতে এবারেও সুমিত্রার মাথায় বজ্রাঘাত। ছেলে অনার্সই পায় নি, পাস কোর্সে পাস করেছে।

পাঁচ মাস আগের সেই মর্মান্তিক ব্যাপারটা ঘটে গেল এই নিয়ে। দোষের মধ্যে হেসে হেসে রমেনবাবু বলেছিলেন, অনেক তো দেখলে, এবারে ছেলেটাকে রেহাই দিয়ে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে বেরোক, কাজকর্ম শিখুক—ভালোই করবে।

শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন সুমিত্রা।—ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেনি, তুমি কুলিমজুর ঠেঙাচ্ছো, ঠেঙাও—

রমেনবাবুও সশ্লেষে বলে উঠেছেন, আমাকেও তুমি একটু বড় গোছের কুলিমজুরই ভাবো জানি—আর ঠিকই জানো। আমার ছেলে

ওই কুলিমজুরের কাজটাই ভালো পারবে। আর তাতে লজ্জারও কিছু নেই, সেটা মগজে একটু বুদ্ধি থাকলে এত দিনে বুঝতে। তোমার বাবা আর দাদা শুনলাম এবারে সুমুকে চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্সি পড়াতে বলেছে আর তুমিও তাই শুনে নাচছ—কিন্তু আমার কাছে শুনে রাখো তাতে ভস্মে ঘি ঢালা হবে—আর কিছু হবে না।

সুমিত্রার খরখরে দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির খানিকক্ষণ।—অভদ্রের মতো চেঁচিও না, সুমুর ব্যাপারে কেউ তোমার পরামর্শ চায়নি।

রমেনবাবু আরো উগ্র।—কেন কেউ চায় নি? কেন তুমি চাও নি?

—তোমার সে যোগ্যতা আছে ভাবি না।

—সেটা ভাবতে হলে নিজেরও কিছু যোগ্যতা থাকার দরকার—ভাববে কি করে? রক্ত জল করা টাকা মুঠো মুঠো খরচা করতে পেলে তোমার মতো কালচারের ছটা সকলেই দেখাতে পারে—বুঝলে?

রাগে মুখ সাদা সুমিত্রার।—আবার বলছি, ছোটলোকের মতো চেঁচিও না। এই কালচারের পিছনেই হাতজোড় করে ছুটেছিলে একদিন—

ছোটলোক শুনে মাথায় রক্ত উঠল রমেনবাবুর।—আমি সত্যিকারের গাধা বলেই এমন ভুল করেছিলাম, এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি!

খাটের বাজু ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন সুমিত্রা।—এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছ?

—স্বামীকে ছোটলোক বলার পরেও বুঝতে পারা উচিত নয় ভাবছ?

—ঠিক আছে? বুঝতে যখন পেরেছ, আমার ব্যবস্থা আমি এখনো করব। ছেলে সি. এ. পড়বে কি পড়বে না?

—পড়বে না! পড়বে না! রমেনবাবু এতকালের সব আক্রোশ উজাড় করে দিতে চাইলেন।—আমার মতো ছোটলোকের ছেলে আমার মতোই ছোটলোক হবে। তোমার বাবা মাকে গিয়ে বলো তাঁদের

ঘরের নাতি-নাতনিকে এক একখানা করে হীরে-জহরত বানাতে—আমার ছেলের দিকে তাকাতে হবে না।

সুমিত্রা শেষবারের মতোই যেন দেখে নিলেন তাঁকে। তারপর বললেন তোমার ছেলেও আর তাহলে তোমার ছেলে থাকবে না?

ছেলেকে নিয়ে সুমিত্রা বাপের বাড়ি চলে গেলেন। সুমুর যাবার ইচ্ছে থাকুক আর না থাকুক, মায়ের অবাধ্য হবার সাহস নেই। এবারে যাওয়াটা অন্যান্য বারের যাওয়ার মতো নয় রমেনবাবু সেটা অনুভব করেও চুপ একেবারে। তাঁরও গোঁ চেপে গেছে। শ্বশুরের প্রথম চিঠি পেয়ে আরও তেঁতে উঠেছিলেন। মেয়ের কাছে তাকে মাপ চাইতে বলা হয়েছে! দ্বিতীয় চিঠিতে ডিভোর্সের হুমকি। সে চিঠির জবাব রমেনবাবু দিয়েছেন। আর তারপর থেকে শেষ ফয়েসলার জন্যেই প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু বুকের ভিতরটা খালি খালি লাগে। তার ফলে নরম হবার বদলে নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি।

পাঁচ মাস বাদে এই সকালে আচমকা পট পরিবর্তন। ছেলেকে নিয়ে সুমিত্রা নিজে থেকে ফিরে এসেছেন। শুধু তাই নয়, ছেলের প্রতি মায়ের নির্দেশ, এবার থেকে সে বাপের সঙ্গে বেরোবে, তাঁর কাছে কাজ শিখবে!

রঘুর সঙ্গে সুমিত্রাও রান্নায় হাত লাগিয়েছেন আজ। সেই ফাঁকে সুমুকে আবার কাছে ডাকলেন রমেনবাবু। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার রে, তোর মায়ের হঠাৎ এরকম মত বদলালো কেন?

শুনে ছেলে প্রথমে হাসতে লাগল। তারপর বলল, মা আমাকে কিছু বলেন নি, কিন্তু আমি জানি কেন বদলালো।

—কেন? রমেনবাবু আরো উদ্‌গ্রীব।

চাপা আনন্দে স্নমু এবারে যে চিত্রটি তাঁর সামনে তুলে ধরল, রমেন-বাবুর মুখে আর কথা সরে না। ত্ব'কান ভরে শোনার মতোই বটে।

...মায়ের মেজাজ খারাপ, স্নমুর দাত্ব তাই সকলকে নিয়ে মাদ্রাজে বেড়াতে গেছলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ধীরে স্নস্থে ডিভোর্সের মামলার ব্যবস্থা করার কথা। স্নমুর মামাও দাত্বর দিকে।

...মাদ্রাজে মস্ত সফ্ট ড্রিংক-এর রেস্তোরাঁ আছে। সকলে সেটাকে শেঠজীর 'ঠাণ্ডা ঘর' বলে, বিরাট ব্যাপার। বড় বড় লোকেরা গাড়ি হাঁকিয়ে আসে সেখানে। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জম-জমাট ব্যাপার। দিশী বিলিতি যাবতীয় কোল্ড ড্রিংক-এর বিশাল এয়ারকনডিশন রেস্তোরাঁ। কত বেয়ারা আর বয় খাটছে ঠিক নেই।

স্নমুরা দল বেঁধে সেই কোল্ড ড্রিংক-এর রেস্তোরাঁয় তিন চার দিন গেছে। ঠাণ্ডী ঘরের মালিক আধবয়েসী—শেঠজীকে মারসিদিস গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। কিন্তু স্নমুরা তাঁর ওপর মনে মনে খুশী নয় তেমন। গদিতে বসে শ্যেন দৃষ্টি মেলে সকলের কাজের তৎপরতা দেখেন! খদ্দেরকে খুশী করার ব্যাপারে বয় বা বেয়ারাদের এতটুকু ত্রুটি দেখলে তাকে কাছে ডেকে চাপা গলায় বেশ করে ধমকে দেন।

এদের মধ্যে একটি 'বয়' সকলের দৃষ্টি কেড়েছিল। বছর তের চৌদ্দ বয়েস। ফুটফুটে গায়ের রং ভারী মিষ্টি চেহারা। একমাথা কোঁকড়া চুল। ডাগর চোখ। ছেলেটা যেন সারাক্ষণ উৎসাহ আর উদ্দিপনায় ফুটছে। খদ্দের দেখলেই ছুটে যাচ্ছে, ছাপা মেন্নু কার্ড সামনে রেখে যাচ্ছে। খদ্দের জিজ্ঞাসা করলে কোন ড্রিংক-এর কি বৈশিষ্ট্য গড় গড় করে বলে যাচ্ছে। প্রথম দিন কি নেবে স্নমুরা ঠিক করে উঠতে পারছিল না বলে ছেলেটা মিষ্টি গলায় স্নমিত্রাকে বলল, চকোলেট দেওয়া ক্রিম মিল্ক শেক সিন ম্যাডাম, আমি বলছি ভালো লাগবে।

চার্ট দেখে স্নমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, প্লেন পাইন অ্যাপেল মিল্ক শেক-এর থেকে দাম বেশী কেন?

সোৎসাহে ছেলেটা বোঝালো কেন দাম বেশী। একটা ইলেকট্রিকে

তৈরী হয়। অন্যটা হাতের কাজ। এতে রিস্ক বেশী, মেহনত বেশী। গড়গড় করে আরো কত কি বলে গেল ঠিক নেই।

সমস্ত রেস্তোরাঁয় ওই একটা ছেলে যেন ফুলের মতো মিষ্টি সৌরভ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সকলে তাকে ডাকে, সকলে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফলে ছেলেটার ছোটাছুটির বিরাম নেই। অমন সুন্দর ছেলেটা যেন এই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

সুমুর মামী আবার একটু আধটু গল্প-টল্প লেখেন। তাঁর ধারণা, বড় দুঃখের জীবন নিশ্চয় ছেলেটার। ভদ্রঘরের ছেলে যে তাতেও সন্দেহ নেই। অভাবের দায়ে হয়তো অসুস্থ বাপ-মা এই বয়সের এমন ছেলেকে এমন কাজে ঠেলে দিয়েছে।

সেদিন রাত সাড়ে দশটায় সুমুরা সকলে মিলে সেই ঠাণ্ডা ঘরে গেছল।

খদ্দেরের ভীড় তখন বেশ হালকা। এবারে দোকান বন্ধ হবার কথা। তাদের দেখে সেই ছেলেটা ছুটে এল। এই ক'দিন তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে। কিন্তু গল্প করার সময় ছেলেটা পায় না। ছেলেটা তখন দস্তুর মতো ক্লান্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তবু হাসি মুখ।

তাকে দেখে সুমিত্রার বাবা মা দাদা বৌদি সকলের মায়া হল। আর রাগ হল দোকানের মালিক ওই শেঠজীর ওপর। দোকান বন্ধের আগে গদিতে বসে তখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুনছে। ওদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ষোল আনা ওই লোকটাই শুষে নিচ্ছে। এরা হয়তো দু'বেলা ভালো করে খেতেও পায়না, আর ওই নিষ্ঠুর মালিক মারসিডিস হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।

ছেলেটার নাম শঙ্কর। সেই রাতে সুমিত্রা তাকে এক গেলাস কোল্ড ড্রিংক খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছেলেটা একবার দূরের মালিকের দিকে চেয়ে হাসিমুখেই মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এখন খাবে না। পাছে ছেলেটার কাজের ক্ষতি হয়, সেজন্য কেউ আর তাকে পীড়াপীড়ি করল না। কাজের ক্ষতি হলেই তো ওই অকরুণ মালিকের কাছে

বকুনি খাবে। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, আজও তুমি সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এসেছ?

—না আমি পাঁচটায় আসি। আধ ঘণ্টা আগে এসে সব দেখেশুনে নিতে হয়।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, সকাল থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তুমি কি করো?

—সকালে বাড়িতে পড়ি তারপর স্কুলে যাই। তারপর বিকেলে খেয়েদেয়ে দোকানে আসি।

—রোজ?

—রোজ।

সুমিত্রার বউদি জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে তোমার কে আছেন?

—সবাই আছে।

—বাবা মা?

ছেলেটা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আছে। তারপর মিষ্টি হেসে বলল, আমার ভাইবোন দুটো ছোট তো, তাই মা আর দোকানে আসতে পারে না। তারপর সকলকে হতবাক্ করে দিয়ে অদূরে গদিতে বসা দোকানের মালিক শেঠজীকে দেখিয়ে বলল, ওই তো আমার বাবা, দোকান বন্ধ হলে বাবার সঙ্গেই আমি বাড়ি ফিরি। তারপর লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, বাবা বুড়ো হয়ে গেলে আমাকেই তো এত বড় দোকানখানা চালাতে হবে, তাই রোজ বিকেলে বাবা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে আর সেই রাতে একেবারে দোকান বন্ধ করে একসঙ্গে বাড়ি যাই।……আমার খুব ভালো লাগে। আর বাবা যখন নিজে কড়া খদ্দের সেজে টেবিলে বসে আমাকে সার্ভ করতে বলে আর গম্ভীর মুখে মিথ্যে মিথ্যে দোষ বার করতে থাকে তখন কি মজা লাগে না! আমার কিন্তু তখনো হাসার উপায় নেই, সত্যিকারের খদ্দেরের মতোই তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়।

সুমুর শেষ কথায় সম্বিত ফিরল যেন রমেনবাবুর। সুমু বলছে,

ছেলেটার সেই মিষ্টি মিষ্টি হাসি দেখে আর মিষ্টি কথা শুনে মায়ের মুখখানা যা হয়ে গেল না—তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না বাবা।

তারপর বাড়ি এসেই আমার ওপর ওই হুকুম। শুনে দাদু আর দিদা রাগ করলে, কিন্তু মা আর কোন কথায় কানও দিল না। তারপর আজ হাওড়া স্টেশানে পা দিয়েই আমাকে নিয়ে সোজা এখানে চলে এলো।

সুমিত্রা ঘরে ঢুকতেই ছেলে আর বাবা সচকিত। মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সুমু যেন ধরাই পড়ে গেল। লজ্জা পেয়ে তক্ষুনি প্রস্থান করল।

রমেনবাবু সুমিত্রার দিকে চেয়ে আছেন। সুমিত্রা তাঁর দিকে।

…বাইশ বছর বাদে দু'জনে দু'জনকে নতুন করে দেখছেন।

এক দিন গেল। দু'দিন গেল। তিন দিন গেল। চার দিন গেল।

পাঁচ দিনের দিন খবরটা যেন খড়ের গাদায় আগুনের ফুলকির মত ছড়িয়ে পড়ল। সকালে ঊর্মিলা খাটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল। বৃদ্ধা শাশুড়ী ঘরে ঢুকলেন প্রথম। মাথায় কাপড় টেনে ঊর্মিলা উঠতে যাচ্ছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন, থাক্ থাক্ উঠতে হবে না। বোসো।

বউয়ের গা ঘেঁষে নিজেও বসলেন তিনি। মুখের কাছে মুখ এনে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। ছানি-কাটা চোখে আবছা দেখেন। সময় লাগল তাই। পরে ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি নাকি? অ্যাঁ? সত্যি?

আশায় আগ্রহে বৃদ্ধার ঘোলাটে চোখও চক্চকে দেখাচ্ছে। বউয়ের পিঠে ঘন ঘন হাত বোলাতে লাগলেন তিনি। অধীর কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, বল না গো, বড় বৌমা যা বললে সত্যি?

ঊর্মিলা সামান্য মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সত্যি।

পিঠের ওপর শাশুড়ীর শীর্ণ হাত থেমে গেল। দু'চার মুহূর্ত চোখ বুজে ইষ্টদেবতাকেই স্মরণ করে নিলেন বোধ হয়। পরে আবার তেমনি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন মাস··· ?

ঊর্মিলা এবারে আরো সুস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়লে।

আসল খবরে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি চাপা রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন, কি জানি বাছা কেমনতরো কাণ্ডজ্ঞান তোমাদের, আমাকে যমে ভুলেছে বলে তোমরাও ভুলতে বাকি রাখলে না কিছু।···বড় বৌমা কবে জেনেছে, আজ সকালে?

ঊর্মিলা নত মুখে জবাব দিল, চার পাঁচ দিন।

চার পাঁচ দিন! আবার কাছে ঘেঁষে এলেন তিনি। প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায়

মুখখানা বিকৃত দেখালো প্রায়। কানে কানে বলার মত ক'রে বললেন, দেখলে আক্কেলখানা? আমাকে এই তো একটু আগে জানালো! আর তোমাকেও বলি, সাত তাড়াতাড়ি বেছে তাকেই আগে বলতে গেলে? আমাকে খবর দিলে না তো হাঁড়িমুখ করে যেন শোক কথা শোনালে—ষাট্ ষাট্ ষাট্—তুমি বাছা একটু বুঝেসুঝে চ'লো।

আনন্দাতিশয্যে গাত্রোত্থান করে তাড়াতাড়ি তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। এর পরে কি হবে উর্মিলা আঁচ করতে পারে। এত কাল ধরে ঠাকুর দেবতাদের মত মানসিক পাওনা হয়েছে, এবারে সেগুলো সব সুদে আসলে মিটবে। কিন্তু আবারও ফিরলেন তিনি। —নিশি খবর পেয়েছে? তাকে জানিয়েছ তো?

উর্মিলা জবাব দিলে না। এক বারে জবাব না পেলে শাশুড়ী রেগে ওঠেন জেনেও। গলা চড়ল তাঁর, কথাটা তোমার কানে যাচ্ছে না? নিশিকে খবর দেওয়া হয়েছে?

উর্মিলা এবারে হেসে বলল, জায়গায় জায়গায় ঘুরছেন, কোথায় কোন ঠিকানায় লেখা হবে? চিঠি আসুক।

সত্যি কথা নয়। আবার এক পসলা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই এ রকম বলল। জবাবটা শাশুড়ীর মনঃপূত হল না খুব। ছেলের উদ্দেশে গজগজ করতে করতে তিনি প্রস্থান করলেন।

দত্ত বাড়িতে পোষ্য-সংখ্যা খুব কম নয়। ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে এক জন পিসি-শাশুড়ীর গোটা সংসার এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে। শাশুড়ীরই সমবয়সী বিধবা তিনি। খবরটা শাশুড়ী প্রথম তাঁর কাছেই সংগোপনে প্রকাশ করলেন। ফলে অন্যান্য সকলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই জেনে গেল। একে একে তারা এসে উর্মিলার ঘরে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবতে গেলে খুব সুখবর নয় হয়তো। তবু খবর তো একটা। একেবারে অভাবিত অপ্রত্যাশিত খবর। যে ঝি-চাকরানীদের সাতবার ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না, খুঁটিনাটি কাজের অছিলায় তারাও এক আধ বার দর্শন দিয়ে গেল। দুপুরের দিকে পাড়া

প্রতিবেশিনীদের আসা-যাওয়া সুরু হ'ল। খবরটা তাদেরও কানে পৌঁছলে। খবরের মত খবর, পৌঁছুবে বই কি। কেউ শুধু দেখে গেল। কেউ উপদেশ দিলে। কেউ বা ঠাট্টা-তামাসা করলে। শাশুড়ী মিষ্টি-মুখ না করিয়ে ছাড়লেন না কাউকে। বিকেলের মধ্যে বোধ করি গোটা মহেশপুরে জানাজানি হয়ে গেল, বংশধর আসছে দত্ত-বাড়িতে।

বংশধর! দত্ত-বাড়িতে? পশুপতিনাথ দত্তের বাড়িতে বংশধর!

এ বিস্ময়ের পিছনে একটুখানি সেকেলে ধরনের ইতিহাস আছে। মহেশপুরে দত্ত-বাড়ির নাম-ডাক পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন। সবাই চেনে। আর এ-বাড়ি সম্বন্ধে এখনো এক ধরনের আগ্রহ আছে সকলের মনে। মহেশপুরের মহেশ দত্ত আজ বিস্মৃত পুরুষ। কিন্তু পশুপতিনাথ দত্ত এখনো গল্পের মতোই বহুবিশ্রুত। তাঁর রাগ, তাঁর দাক্ষিণ্য আর তাঁর বিলাস-অপচয়—এই তিন নিয়ে তাঁর পরিচয়। ক্রোধের আগুনে বহু জনের সর্বস্ব পুড়েছে, দাক্ষিণ্যের করুণায় বহু জনের সর্বস্ব লাভ হয়েছে। আর অপচয়ের ফাটল দিয়ে প্রাচুর্য-লক্ষ্মী দ্রুত নিঃসৃত হয়েছে। কিন্তু এ বাড়িতে নতুন বংশধর আসার সম্ভাবনায় লোকের আগ্রহ এবং বিস্ময়ের পিছনে রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে। এই বাড়ি বলেই সম্ভবত লোকে ভোলেনি সে কাহিনী। কোন্ সিদ্ধবাক্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের না কি অভিশাপ আছে, নির্বংশ হবে দত্ত-বংশ। কেউ এর সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যাকে জড়িয়েছে, কারো বা বিশ্বাস, পরদেশীর বিচারালয়ে ব্রাহ্মণের একটি ছেলের ফাঁসীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল পশুপতিনাথের জটিল ষড়যন্ত্রে এবং বিশ্বাসঘাতকতায়।

একটা অভিনব যোগাযোগও ঘটে যায়। পশুপতিনাথের হঠাৎ খেয়াল হয়, বড় ছেলে আদিত্যনাথ নিঃসন্তান। বছর দশেক আগে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। অন্দর মহলে অবশ্য আড়ালে-আবডালে অনেক কথা হ'ত। কিন্তু কর্তার ভয়ে বাইরে কেউ টুঁ শব্দটি করত না। কারণ, এই দুর্ধর্ষ মানুষটির অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল বড় বউ শৈলবালার প্রতি। এই একজনের বেলায় স্নেহ-মমতায় একেবারে অন্ধ ছিলেন যেন। একবার

বউকে গঞ্জনা দেবার ফলে ছেলেকে খড়ম-পেটা করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন তিনি। বাড়ির বউকে এতটা প্রশ্রয় দিতে দেখে শাশুড়ী রাগে জ্বলতেন। আজও সংসারে বড় বউয়ের গুরু-গম্ভীর আধিপত্য দেখে সখেদে স্বর্গগত স্বামীকে টেনে আনেন তিনি— আস্কারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়ে গেছে, ইত্যাদি। আজকের কথা থাক। কনিষ্ঠ নিশানাথ তখন ছোট। পশুপতিনাথ হঠাৎ আদিত্যনাথকে ডেকে আদেশ করলেন, আবার বিয়ে করতে হবে, এবং অচিরেই। শুনে আদিত্যনাথ হতভম্ব। পরে অবশ্য খুশী হলেন। বৌয়ের দেমাক ভাঙ্গবে। বাবার ভয়ে হোক বা যে জন্যেই হোক, বউকে বিলক্ষণ সমীহ করে চলতেন তিনি। আর খুশী বোধ হয় শাশুড়ীরও হলেন। কত জায়গা থেকে কত অর্থব্যয় করে এক একটা তাবিচ কবচ সংগ্রহ করে আনতেন তিনি, কিন্তু ভক্তিভরে সে সব ধারণ করা দূরে থাক, গরবিনী একবার হাতে তুলে নিয়েও দেখেন নি, এবারে বুঝুক মজা—

কিন্তু মজা আবার ফিরে তাঁরাই দেখলেন। বিয়ের কথাবার্তা তোড়-জোড় চলছে। শৈলবালা শ্বশুরকে শুনিয়ে শান্ত মুখে জানিয়ে দিলেন, বিয়ে আর একটা ছেড়ে পাঁচটা হোক, তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু এ রকম সংসারে ছেলেপুলে হবার নয়, এটা তিনি জেনে রেখে দিতে পারেন, এর জন্য বাইরে থেকে কারো শাপ-শাপান্তের দরকার ছিল না।

কথাগুলোর ইঙ্গিত স্পষ্ট। পশুপতিনাথ নির্বাক্। সেই থমথমে গম্ভীর মূর্তি দেখে দুরুদুরু বুকে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সকলে। এবারে নারী-হত্যাই ঘটে কিনা কে জানে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। শুধু বিয়ের কথাবার্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তবে যত দিন জীবিত ছিলেন, পুত্রবধুকে আর কাছে ডাকেন নি কোনদিন। দু'বছর না যেতে শৈলবালা যখন বিধবা হলেন, তখনো না। তাঁর অজস্র অপচয়ের মধ্যেও খানিকটা পৌরুষ ছিল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত আদিত্যনাথ ভিতরে ভিতরে বিকল হয়ে আসছিলেন অনেক দিন ধরেই। তবু তাঁর মৃত্যুতে

ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের যোগাযোগটাই বড় করে দেখলে মহেশপুরের লোকেরা। অভিসম্পাতের দশ বছর আগে থেকেই তিনি যে নিঃসন্তান ছিলেন, এও বিশেষ মনে থাকল না কারো।

তারপর পশুপতিনাথও গত হয়েছেন, একটানা কতগুলো বছর কেটে গেছে। পড়াশুনো শেষ করে নিশানাথ ধীরে সুস্থে বিষয়-আশয় বুঝে নিয়েছে। শৈলবালা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দেওরের সংঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক প্রীতির নয়, বরং স্নেহের বলা যেতে পারে। কিন্তু তাও অনেকটাই প্রচ্ছন্ন। উচ্চ শিক্ষার দরুন হোক বা যে জন্যেই হোক, বংশগত অপচয়ের প্রভাবটুকু নিশানাথকে তেমন স্পর্শ করেনি। কিন্তু পিতৃকুলের সেই দুর্দম স্বভাব, বনিয়াদী মেজাজ, অথবা খেয়ালী চাল চলনের কিছুটা মিল লক্ষ্য করলে ওর মধ্যেও দেখা যেতে পারে। শিক্ষার সংযম এ দিকেও অনেকটাই রাশ টেনে রেখেছে বটে, তবু বোঝা যায়।

সময় মতই বিয়ে করেছে। সেও আজ আট-ন' বছর হয়ে গেল। কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি। হবার আশাও সবাই ছেড়েছে। শাশুড়ী এবারে অবশ্য ঊর্মিলাকে ইচ্ছে মত তাবিচ-কবচ পরিয়েছেন। শৈলবালা দেখেছেন। বাধা দেননি। বরং মাঝে-মধ্যে বিদ্রূপ করে বলেছেন, পর, পরে ভাখ্—এ বাড়িতে ছেলেপুলে হওয়া তো দৈবেরই ব্যাপার!

এ ধরনের শ্লেষ কানে এলে নিশানাথের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অগ্রজের দ্বিতীয় বিবাহ পরিকল্পনার প্রহসন ভোলেনি। তবু চুপ করেই থাকে। ভয়ে নয়, ভক্তিতেও নয়। সে সব ধাতে লেখেনি। বলে না, বলে কিছু লাভ নেই বলে। শৈলবালা ঝগড়া-বিবাদের ধার দিয়েও যাবেন না। তাঁর শান্ত নীরবতাই ফিরে ব্যঙ্গ করবে ওকে। তা ছাড়া, ভ্রাতৃজায়ার অন্তরের বলিষ্টতার সঙ্গে ওর নিজের বলিষ্ঠতার কোথায় যেন আপস আছে। সেটা ক্ষুন্ন করতে গেলে নিজেরটাও ক্ষুন্ন হবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কপালে করাঘাত করে শাশুড়ী নিজেই হাল ছেড়েছেন, দৈব অনুগ্রহও তাঁর অদৃষ্টে জুটল না ধরে নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন তিনি।

এহেন দত্ত-বাড়িতে সহসা বংশধর আসার সম্ভাবনায় ঘরে-বাইরে একটা সাড়া পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

উর্মিলা নিজেই বোধ করি হতভম্ব হয়েছিল সব থেকে বেশি। নিশানাথ জাপান গেছে। উদ্দেশ্য, বৈজ্ঞানিক চাষের কি একটা শিখে আসবে। বছর খানেক লাগবে ফিরতে। সে রওনা হওয়ার দিন পনেরর মধ্যে উর্মিলা খেয়াল করল, মাসটা একটা ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। ব্যতিক্রমটা পরের মাসেও বজায় থাকল। উর্মিলা বিশ্বাস করবে এমন সাহস নেই। অথচ কিছু একটা ঘটেছে সন্দেহ নেই। মুখে একেবারে তালা এঁটে দুরু-দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। তৃতীয় মাসে আর কোনো সন্দেহ রইল না, কতকগুলো লক্ষণ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করল সে। আর গোপন রাখা সমীচীন নয়। কিন্তু একমাত্র বড়জা' ছাড়া বলবেই বা কাকে? শৈলবালার কর্তব্যপরায়ণতার ওপর সবারই আস্থা।

তাঁকেই বলল। শৈলবালা হঠাৎ যেন বুঝে উঠলেন না কি বলতে চায়। বোঝামাত্র স্বভাববিরুদ্ধ আনন্দোচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন তাকে। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন শুধু। অনেকক্ষণ। স্বভাবগত গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে সংযত করে নিলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন মাস বললি নে?

উর্মিলা এ ভাব-পরিবর্তন দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে। ঘাড় নাড়ল।

ঠাকুরপো জেনে গেছে?

না, যাবার দিন পনের বাদে তো প্রথম টের পেলাম।

পরে জানিয়েছিস?

উর্মিলা মাথা নাড়ল আবারও, জানায় নি।

কেন? প্রায় তীক্ষ্ণ শোনাল কণ্ঠস্বর। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আগেই ফুটে উঠেছে।

উর্মিলা জবাব দিল, ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। মনে মনে উষ্ণ হয়ে উঠছে সে। কিন্তু কি আর করবে।

শৈলবালার হু'চোখ তার মুখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলেন,আমাকেই বা আগে বলিস নি কেন?

বললাম তো, নিজেরই ঠিক বিশ্বাস হয়নি। হাসল। এই বড়জা'টিকে শক্ত কথা কিছু বলতে হলে হাসি মুখেই বলতে হবে। বলল, হল কি, তুমি যে দেখি একেবারে পুলিসের জেরা সুরু করে দিলে!

শৈলবালা আর বললেন না কিছু। শুধু আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠে চলে গেলেন। ফিরে দেখলে দেখতে পেতেন, উর্মিলা আগুন হয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা ঈর্ষার কারণ হতে পারে উর্মিলা একবারও ভাবে নি। এখন যেন তাই মনে হচ্ছে।

সন্দেহটা পরদিন থেকে ঘনীভূত হল আরও। এক তুই করে পর পর চার দিন কেটে গেল, অথচ বড়জা' মুখ খুললেন না কারো কাছে। শুধু উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নিঃশব্দে লক্ষ্য করে গেলেন তাকে। উর্মিলা সেটা বুঝেও না বোঝার ভাণ করে কাটিয়েছে। মনে মনে শঙ্কিতও হয়েছে সে। নিশানাথ নেই এখানে, এখন ওনার ওপরেই সব নির্ভর। অথচ মতি-গতি যা দেখছে···

পাঁচ দিনের দিন আবার ঠিক বিপরীত কারণে রাগ হল বড়জা'য়ের ওপর। চার চারটে দিন মুখ শেলাই করে কাটালেন, আবার যখন ঢাক পেটানো সুরু করেছেন, তখন আর বাকি নেই কেউ। ওর ধারণা, তাঁর জন্যেই খবরটা এ ভাবে ছড়িয়েছে। সারা দিন নানা শুভার্থিনীর পদার্পণে মুখ বুজে বসে থেকে ও যেন একটা ধকলের মধ্য দিয়ে কাটল। সন্ধ্যে পার হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার। এবারে পুরুষের ভারী পায়ের শব্দ। উর্মিলা উৎকর্ণ হল। শব্দটা চেনা বটে। বিরক্তি নয়, বরং খুশীর ছোঁয়া লাগল মুখে। উঠে বসল।

বাইরে থেকে গলা শোনা গেল, আসব ?

আসুন। ঊর্মিলা শাড়ির আঁচল মাথায় টেনে দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

শৈলবালার ছোট ভাই শশাঙ্ক। শশাঙ্ক বোস। হাসি চেপে ভুরু কুঁচকে ঊর্মিলার দিকে চেয়ে রইল সে।

বসুন।

শশাঙ্ক শয্যার অপর প্রান্তে আসন নিয়ে তেমনি ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল, এই কাণ্ড তোমার ?

ঊর্মিলা বিস্ময়ের ভাণ করল, কি কাণ্ড ?

শশাঙ্ক হাসল এবার।—ও, নিজের কানে শুনলে অমৃত ঝরবে বুঝি। বলব ?

থাক বলতে হবে না। ঊর্মিলা বিরক্তির ভাব দেখিয়েও হেসে ফেলল, আপনি শুনলেন কোথায় ?

শশাঙ্ক হাসতে হাসতে জবাব দিল, শুধু আমি ? আজকে না ভূত দ্যাখো তুমি, ভাবী বংশধরের পিতামহ পশুপতিনাথও স্বর্গ থেকে হোক বা নরক থেকে হোক, ছুটে আসতে পারেন। শুভ সংবাদ হয় তো সেখানে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।

হঠাৎ কি মনে পড়তে হাসি থামল তার। জিজ্ঞাসা করল, রাস্কেলটা খবর জেনেছে তো ?

কার উদ্দেশে এই মধুর সম্ভাষণ জেনেও ঊর্মিলা নিরীহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, কোন্ রাস্কেলটা ?

তোমার রাস্কেল, আবার কোন্ রাস্কেল।

আমার কোনো রাস্কেল-টাস্কেল নেই। স্বামী নিন্দা শুনলে রেগে যাবো বলছি।

শশাঙ্ক হেসে আবার জিজ্ঞাসা করল, জেনেছ ?

আপনার এক যুগ দেখা নেই, খবর দেবে কে ?

জবাবে শশাঙ্ক একটা স্থূল ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার

আগেই শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করলেন। একে একে দু'জনের দিকেই তাকালেন। পরে ভাইকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এসেছিস?

এই তো। শুধু হাতে যে, মিষ্টি কই?

মুখে কোনো ভাবলেশ নেই শৈলবালার। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোকে একটা খবর পাঠাব ভাবছিলাম, কথা আছে শুনে যাস।

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। শশাঙ্ক ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তাকালো ঊর্মিলার দিকে।—কি ব্যাপার?

ঊর্মিলা ঠোঁট উল্টে দিলে, কি জানি—।

এই লোকটির সঙ্গে ঊর্মিলার হৃদ্যতা সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। হৃদ্যতা নিশানাথের সঙ্গেও আছে। কিন্তু সে এক অদ্ভুত পরস্পর বিরোধী হৃদ্যতা। ছোট থেকে একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে খেলাধূলা করেছে, এক সঙ্গে বড় হয়েছে। কিন্তু ওদের ছেলেবেলার রেষারেষি আজও তেমনি আছে। কে কাকে ব্যঙ্গ করবে বিদ্রূপ করবে জব্দ করবে এই নিয়েই আছে। সোজাসুজি বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ বহুকাল ধরে। কারণটাও কম বিচিত্র নয়। একদা পাখি শিকারে বেরিয়েছিল নিশানাথ। সঙ্গে শশাঙ্কও আছে। কেউ কাউকে শ্লেষ না করে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, তবু পরস্পরের সঙ্গটা চাই। শিকার জিনিসটা শশাঙ্কর পছন্দ নয় তেমন। বন্দুক বাগিয়ে ধরে পাখির ঝাঁকের দিকে সন্তর্পণে এগোচ্ছিল নিশানাথ, শশাঙ্ক পিছনে দাঁড়িয়ে। আর একটু এগিয়ে গেলেই হয়, হঠাৎ পিছন থেকে এক ঢিলে শশাঙ্ক পাখির ঝাঁক দিলে উড়িয়ে। নিশানাথ নিশানা ঘুড়িয়ে দিলে, শশাঙ্ক পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে—সেই দিকে। শশাঙ্ক ভাবলে ভয় দেখাচ্ছে। নিশানাথ ঘোড়া টিপলে। হাতে বন্দুক গর্জে উঠল। গুলী শশাঙ্কর কাঁধ থেকে কোমরে ঝোলানো বিশালকায় থলেটা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়ল শশাঙ্ক। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর-থর করে। মৃত্যু-বিবর্ণ।

নিশানাথ বন্দুক কাঁধে ফেলে তার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখে যেন

তখনো পাখি-মারা একাগ্র দৃষ্টিটা বসে আছে। বলল, এইমুঠা কেমন দেখে রাখো।

শশাঙ্ক আর একটি কথাও না বলে বাড়ি ফিরেছে। সেদিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এর পরে নিশানাথ তার বাড়ি আসতে শশাঙ্ক স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তার সঙ্গে বাক্যালাপ রাখতেও সে ঘৃণা বোধ করে। দেহের রক্তকণিকা আবার টগবগিয়ে উঠল নিশানাথের। কিন্তু কিছু না বলে সে ফিরে এলো।

সেই থেকে মুখোমুখি কথাবার্তা বন্ধ। সময়ে ক্রোধ উপশম হয়েছে দু'জনারই। তবু শশাঙ্কর বুদ্ধির ধার বেশি, আর নিশানাথের আভিজাত্যের পৌরুষ বেশি। ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। শৈলবালা মাঝে থাকার দরুন যোগাযোগটা বন্ধ হয়নি। নিশানাথের বিয়ের পর দেখা-শুনাও আরো বেড়েছে। তার বিয়েতে প্রধান উদ্যোগী কর্মকর্তা ছিল শশাঙ্ক। এর আগে অবশ্য শশাঙ্কর পিতৃশ্রাদ্ধ নিশানাথ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্বাহ করে দিয়ে এসেছিল। এখন উর্মিলা বা শৈলবালা অথবা তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ কাছে থাকলে পরোক্ষে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চলে। সে কথাবার্তাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আর এখনো সেই রেষারেষি অনেক সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। নিশানাথ সহজে তেতে ওঠে। কিন্তু শশাঙ্কর মেজাজ অনেক ঠাণ্ডা, তাই তার সুবিধেও বেশি।

বছর খানেক আগের কথা। শশাঙ্ক কি একটা শক্ত অসুখে পড়তে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এনে সাড়ম্বরে তার চিকিৎসা শুরু করে দিল নিশানাথ। শশাঙ্ক সেরে উঠল। এর মাস পাঁচ ছয় বাদে কি করে যেন পা মচকে যায় নিশানাথের। বিছানায় শুয়ে আছে, উর্মিলা কি একটা মালিস করে দিচ্ছে। হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখে, শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে এক জন বড় সার্জেন নিয়ে এসে হাজির। ইশারায় রোগী দেখিয়ে দিতে সার্জেন পায়ের দিকে মনোনিবেশ করলেন। নিশানাথের ইচ্ছে হল, সার্জেনকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়ে শশাঙ্ককে জব্দ করে। কিন্তু মুখ

বুজেই রইল সে। সার্জেন পা দেখে মনে মনে হেসে গম্ভীর মুখে একটা লম্বা প্রেসক্রপশান লিখে দিয়ে ফীস্ নিয়ে প্রস্থান করলেন। ঊর্মিলার বিস্ময় কাটেনি তখনো। নিশানাথ আড়চোখে একবার শশাঙ্কর মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স-মনোযোগে প্রেসক্রপশানটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল।

শশাঙ্ক ঊর্মিলাকে লক্ষ্য করে বলল, একটু চুণ-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দাও। মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ঊর্মিলা প্রথম প্রথম এদের রকম-সকম দেখে ভারী অবাক হত। পরে বেশ মজাই লাগত তার। বলত, বুড়ো খোকারা ঝগড়া করে সবাই দেখে হেসে মরে! এখন অবশ্য ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে অবাক লাগে তার, দু-দুটো লোক এভাবে বছরের পর বছর কাটায় কি করে! ঊর্মিলার এখনও সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে, শশাঙ্ক সাড়ম্বরে চালের কারবারে নেমেছে বলেই তার ওপর টেক্কা দেবার জন্যে নিশানাথ জাপান গেছে বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিখতে।

তিন চার দিনের মধ্যেই চিকিৎসক এনেই ঊর্মিলাকে দেখানো হল। এত তাড়াতাড়ি এর দরকার ছিল না সেটা ঊর্মিলাও জানে। ভাইকে দিয়ে বড়জা' এই ব্যবস্থা করেছেন জানা কথা। সমস্ত দিনে তার সঙ্গে এখন দু'চারটে কথাও হয় কি না সন্দেহ, এ দরদে মন ভিজল না। শাশুড়ী অবশ্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসক একবার পরীক্ষা করে কিছু মামুলী বিধিনির্দেশ দিয়ে গেলেন, দু'মাসের আগে আর তাঁর দেখার প্রয়োজন নেই। তবে, তেমন দরকার হলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

রাত্রিতে ঊর্মিলা চিঠি লিখতে বসল নিশানাথের কাছে। এটা দ্বিতীয় চিঠি। অনেক কাটা-ছেঁড়া অদল-বদল করে প্রথম চিঠিতে বারতা পাঠিয়েছে। লজ্জা কেটে যাওয়ায় এবারে অনেকটা সহজ ভাবেই লিখতে

বসল। কিন্তু লেখা হয়ে উঠছে না। বছর খানেক বাদে নিশানাথ ফিরে এসে পরিবর্তনটা কি রকম দেখবে, কল্পনায় সেই দৃশ্যটা আস্বাদন করতে করতেই অনেকক্ষণ কেটে গেল।

···নিশানাথ সন্তান চেয়েছে। মনে-প্রাণে চেয়েছে। বংশের গায়ে ও-রকম একটা কালি লেগে আছে বলেই আরো বেশি চেয়েছে। কোনো দিন সে এটা ব্যক্ত না করলেও উর্মিলা বুঝতে পারতো। নিশানাথ মুখে ওকে বরং উল্টো কথা বলতো। বলতো, দরকার নেই তার ছেলেপুলের। ওকে নিয়েই দিব্যি সুখে আছে।

সুখে আছে একথা অবশ্য উর্মিলাই ভাবত মনে মনে। কিন্তু মুখ ফুটে সে নিশানাথকে একবার অনুরোধ করেছিল, কলকাতায় একবার কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। শুনে নিশানাথ যেন চমকে উঠেছিল প্রথমটা। পরে হাল্কা ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে, কেন আমাকে নিয়ে তোমাকে চল্‌ছে না?

খুব চল্‌ছে, কিন্তু হবে না-ই বা কেন? বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলো না একবার যাই?

নিশানাথ গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, আমরা দু'জন দু'জনকে নিয়ে বেশ সুখে আছি জানতুম।

এই তুচ্ছ কথার মান ভাঙ্গাতে উর্মিলার যেন একটু বেশি সময় লেগেছিল। নিরালা রাতে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে স্বীকার করেছে, শাশুড়ীর কথা ভেবে, বংশের কথা ভেবে, তার মাঝে মাঝে ভারী ইচ্ছে করে বটে একটি সন্তান আসুক—নইলে সত্যিই এ নিয়ে নিজের তার বিশেষ খেদ নেই।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে উর্মিলার, খুব সত্যি কথা বলেনি সেদিন। মনে হচ্ছে, যে আসছে সে না এলে জীবনই বৃথা। ভাবতে ভাবতে সে রাত্রে চিঠি লেখা হল না।

একদিন দু'দিন করে আরো দু'মাস কেটে গেল। দেহের অস্বস্তি যেন ক্রমশই বাড়ছে উর্মিলার। কিন্তু তার থেকে চতুর্গুণ বেশি অস্বস্তি মনের।

ইতিমধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্যোগ ঘটে গেছে।

বিগত দু'মাসের মধ্যে এয়ারমেলে পর পর সাতখানা চিঠি লিখেছে ঊর্মিলা, কিন্তু নিশানাথ একখানারও জবাব দেয়নি। শেষে তার পাঠানো হয়েছে। তারের জবাব অবশ্য এসেছে। সেও তার কাছে নয়, শৈলবালার কাছে। সংক্ষিপ্ত জবাব। সে ভালো আছে, তার জন্যে কোনো চিন্তার কারণ নেই।

আরো এক মাস গেল। ঊর্মিলা আবারো চিঠি লিখল। চিঠিতে মাথা খুঁড়ল প্রায়। কি হয়েছে, কেমন আছ, জানাও। শেষে আবার তার পাঠালো। এবারও ভ্রাতৃজায়াই জবাব পেলেন।—ভালো আছে, চিঠি লিখে বা তার পাঠিয়ে তাকে যেন আর বিরক্ত না করা হয়। মান অভিমান ভুলে ঊর্মিলা শৈলবালার কোলে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়ল এবার। শৈলবালা তেমনি কঠিন নীরব! একটি কথাও বললেন না। ঊর্মিলা মুখ তুলে দেখে, তার মুখ কাগজের মত শাদা।

শশাঙ্ক ডাক্তার নিয়ে এলো আবার। তিন মাস আগে সেরকম কথাই ছিল। কিন্তু ঊর্মিলা বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে সেই থেকে। দিদির শরণাপন্ন হল শশাঙ্ক। কি ব্যাপার, ডাক্তার বসে আছে, ওদিকে যে উঠ্‌ছেই না!

রূঢ় কঠিন কণ্ঠে শৈলবালা ঝাঁপিয়ে উঠলেন প্রায়, উঠ্‌ছে না তো আমি কি করব! আর তোরই বা অত দরদ কিসের? না ওঠে তো ডাক্তারকে বিদেয় করে দিয়ে নিজের কাজ দ্যাখগে যা।

শশাঙ্ক হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিশানাথের ব্যবহার তারও অজ্ঞাত নয়। দিন কতক আগে সেকথা শোনার পর আক্রোশে একেবারে ফেটে পড়েছিল। চড়া গলায় কটূক্তি করে উঠেছিল, তোমাদের অত সাধের বনেদি ঘরের ছেলেদের বিশেষত্বই তো এই—কোথায় কার খপ্পরে গিয়ে পড়েছে দ্যাখো। শৈলবালা সেদিনও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠেছিলেন তাকে। তাঁর চোখের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির আঁচ যেন গায়ে

এসে লাগছিল। ঊর্মিলাও ছিল সেখানে। শশাঙ্কর মন্তব্য শুনেই সম্ভবত একবারও মুখ তোলেনি।

শশাঙ্ক সোজা ঊর্মিলার ঘরে এসে ঢুকল। বাহুতে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে সে। ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল, ডাক্তার এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ, তাঁকে এখানে নিয়ে আসব না ফিরে যেতে বলব?

সাড়া শব্দ নেই।

চলে যেতে বলি তাহলে? আমারও এত সময় নেই যে একটা অপদার্থ লোকের কথা ভেবে ভেবে তুমি নিজের সব কিছু মাটি করবে আর আমি বসে বসে সাধ্য-সাধনা করব। উঠবে?

ঊর্মিলা চোখের ওপর থেকে হাত নামালো। বসলও উঠে। ফর্সা মুখ নিঃসাড় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। শশাঙ্ক চেয়ে রইল খানিক। পরে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। একটু বাদেই চিকিৎসক সঙ্গে করে ফিরল আবার শৈলবালাও এলেন। শশাঙ্ক বাইরে এসে বারান্দার রেলিংএ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

এখনও চিকিৎসকের দেখবার বিশেষ কিছু নেই। নিয়মিত পরীক্ষা শুরু হবে মাস খানেক পর থেকে। তবে, ঊর্মিলার শরীরের জন্য একটু উদ্‌বেগ প্রকাশ করে গেলেন।···শরীর এ সময়ে খারাপ হয় বটে, তবে এ যেন একটু বেশি খারাপ।

বাড়িতে কি একটা অশান্তি চলেছে শাশুড়ী ঠিক বুঝে ওঠেন না। নিশানাথের কথা জিজ্ঞাসা করলে শৈলবালা বলেন, ভালো আছে। শাশুড়ী ধরে নিয়েছেন হিংসেয় মুখখানা অমন পাথর করে রেখেছে বড় বৌ। চুপি চুপি ঊর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কোন দুর্ব্যবহার করে কি না তার সঙ্গে। ঊর্মিলা মাথা নাড়ে। চোখে তিনি কম দেখেন। ঊর্মিলার সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, ভারী রোগা হয়ে গেছ যে! নিজের হাতে পাঁচ রকম মুখরোচক খাবারের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া আর এক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত তিনি। সাত মাস এসে পড়ল। ঘটা করে সপ্তামৃত দিতে হবে বউকে। কোনো বাড়ির এয়ো বাদ থাকবে না।

সবাইকেই ডাকতে হবে। দত্ত-বাড়িতে আসছে বংশধর, এতে আর যাই হোক, কোন কার্পণ্য বরদাস্ত করতে পারবেন না তিনি।

উর্মিলার থেকে থেকে মনে হয়, সমস্ত শরীরটা কেমন যেন বিষিয়ে উঠছে। মন বিষিয়ে যাচ্ছে ব'লে কি? কিছু ভাল লাগে না তার। কিছু না। এ সময়ে নাকি একটু নড়াচড়ার ওপরে থাকতে হয়। কিন্তু নড়তে-চড়তে বিষম কষ্ট। দিনের বেশির ভাগ সময়ই শুয়ে কাটায় আর আবোল তাবোল ভাবে।

সেদিনও সকালের দিকে শুয়েই আছে।···বাইরে যেন অনেকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। একটু কোলাহলও। পরক্ষনে ঝি উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ঢুকে খবর দিয়ে গেল, ছোটবাবু এসেছেন গো বৌদিমণি! কর্তামায়ের সঙ্গে কথা কইছেন।

উর্মিলার বুকের ভেতরটা আচমকা ধড়াস করে উঠল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। নিচের দিকে কেমন একটা যাতনা অনুভব করল। তাড়াতাড়ি উঠতে গেছে বলেই বোধ হয়। দরজার দিকে তাকালো। উত্তেজনায় বুক কাঁপছে ঠক ঠক করে।

ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল বাইরে। ধীর পদক্ষেপে কেউ আসছে। নিশানাথ—। উর্মিলার স্বামী নিশানাথ। শয্যার হাত দুই দূরে এসে দাঁড়াল।

পরস্পরের দৃষ্টি সংবদ্ধ থাকে কিছুক্ষণ। সামলে নিয়ে উর্মিলাই প্রথম কথা বলল। কিন্তু ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে থর-থর করে।

···কেমন আছ?

নিশানাথ চেয়ে আছে তেমনি। পরে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে শয্যার ওপরেই বসল। চোখ দুটো একবার উর্মিলার সারা দেহে বিচরণ করে বেড়াল, যেন বিশ্লেষণ করে করে দেখছে কিছু। তারপর সেই স্থির সূক্ষ্ম দৃষ্টি ওর মুখের ওপর ফিরে এসে থামল। জবাব দিলো, ভালো—।

এমন না জানিয়ে চলে এলে যে?

এলাম···কেন খুশি হওনি?

এই কথাগুলোই অনুরাগসিক্ত হলে অন্য রকম শোনাত। কিন্তু সে রকম শোনাল না। উর্মিলা নির্বোধ নয়। যে নিশানাথ বিদেশে গিয়েছিল, আর যে নিশানাথ ফিরে এসেছে তারা একই মানুষ হলেও এক যে নয় সেটা সে উপলব্ধি করতে পারে। তফাতের পরিমাণটা বুঝতে হবে, তফাতের কারণটা বুঝতে হবে। চোখের জল জোর করে ঠেলে আবার যেন ভেতরে পাঠিয়ে দিলে সে। কাঁদবে কি!···কৈফিয়ৎ নেবে। সে শক্ত হবে। কঠিন হবে। কথা কটা শোনা মাত্র সারা দেহে যেন জ্বালা ধরে গেল। কিন্তু তাড়া কিছু নেই। এত দিন তিলে তিলে জ্বলেছে, আরও দু'চার ঘণ্টা সহ্য হবে। উর্মিলা দেখছে চেয়ে চেয়ে।

দরজার কাছে শৈলবালা এসে দাঁড়াতে নিশানাথ খাট ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে এলো। উর্মিলা মাথায় কাপড় দিলে। শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করলেন। নিশানাথ পায়ের ধূলো নিলে। তিনি মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্বল্পক্ষণ। পরে বললেন, যে চালের চাষ শিখতে গিয়ে এমন মূর্তি করে আনলে, সে চাল লোকের সহ্য হবে তো?

নিশানাথের মুখে হাসির মত দেখা দিল একটু। জবাব দিল, কি মনে হয়, সহ্য হবে না?

কোনো অর্থ আছে কি না কে জানে। শৈলবালার সহজ ভাবটা মিলিয়ে গেল। উর্মিলার দিকে তাকালেন একবার। সে নতনেত্রে বসে আছে। পরে শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, কত দিনের মধ্যে একটা খবর পর্যন্ত নেই···হুট্ করে চলে এলে যে।

নিশানাথ নিস্পৃহ জবাব দিল, পাসপোর্ট পেলে আরো আগেই আসতুম। হাসল।—আমার খবরের জন্যে তোমরা সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে, না?

না, আমরা আর এমন কি আপনার লোক, তবে মা আছেন বাড়িতে, সেটা খেয়াল রাখতে পারতে।

শাশুড়ীর বোধ হয় এখনও আয়ুর জোর আছে। দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। তাড়াতাড়ি জপটা সেরে এলেন বোধ হয়। বললেন, তুই

এখনো রাস্তার জামাকাপড় ছাড়িস নি! ও-গুলো ছেড়ে হাত-মুখ ধো। নয়তো একেবারে চানই করে আয় আগে। জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তার পর যত খুশি গল্প কর বসে।

শৈলবালার দিকে চেয়ে একগাল হাসলেন তিনি। দেখো বড় বৌমা, ভগবান কেমন সুমতি দিয়েছেন ওকে। যত দিন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে সেধোচ্ছিলাম, কে দেখে কে শোনে। খেয়াল হ'ল বোধ হয়, এ রকম বলাটা ঠিক হল না। তাড়াতাড়ি শুধরে নিতে গেলেন, শশাঙ্ক আছে তাই নিশ্চিন্দি। ডাক্তার ডাকা ওষুধ আনা খোঁজ খবর করা—সোনার টুকরো ছেলে, নইলে পরের ছেলেকে আর অতটা করে?

নিশানাথ বক্র কটাক্ষে উর্মিলার দিকে তাকালো একবার। পরে শৈলবালার দিকে। নিষ্প্রাণ পটের মূর্তি। ঝিয়ের মুখে কুলপুরোহিতের আগমন-বার্তা শুনে বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। পরশু কাজ, তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

নিশানাথ জিজ্ঞাসা করল, কি একটা উৎসবের কথা যেন বলছিলেন মা, কবে?

শৈলবালা জবাব দিলেন, পরশু। পরে বললেন, চান-টান যা করবে করো, আমি এদিকে দেখছি। তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নিশানাথ শয্যায় বসল আবার। জামার বোতাম খুলতে খুলতে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, দত্ত-বাড়িতে বংশধর আসছে তা হলে···?

উর্মিলা নিরুত্তরে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল। নিশানাথ কি ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, শশাঙ্ক ব্যবসা-ট্যাবসা ছেড়ে দিয়েছে?

উর্মিলা তাকালো তার দিকে।—ছাড়বে কেন?

ডাক্তার ডেকে ওষুধ-পত্র এনে এত খোঁজ-খবর করে আর ব্যবসার সময় পায়?

ওদের একজনের বিরুদ্ধে আর একজনের এ রকম ঠেস দেওয়া কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত উর্মিলা। আজ সশ্লেষে পাল্টা প্রশ্ন করল।—তুমি

এত দিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে কেন? দরকার হলে সব ছেড়ে-ছুড়ে সে এখানে এসে বসে থাকতে পারে সেই ভরসায়?

নিশানাথ দেখছে। ঊর্মিলা আবার বলল, যাও চান সেরে এসো, দিদি অপেক্ষা করছেন।

নিশানাথ হঠাৎ হাসতে হাসতেই উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ঊর্মিলার মনে হল, মানুষটার হাসিও বদলেছে, তাতেও শ্রী নেই।

বিকেলের আগে নিশানাথের আর দেখা পাওয়া গেল না। ঊর্মিলা খোঁজ নিয়ে জেনেছে, বাইরের মহলে আছে। বিকেলে মায়ের সঙ্গে স্বল্পক্ষণ কথাবার্তা বলে নিশানাথ ভ্রাতৃজায়ার ঘরের পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘরে আর কেউ আছে। গলার স্বরে বুঝল কে। ভাবলো ভিতরে ঢোকে। কিন্তু কি ভেবে চলে এলো।

ঊর্মিলা খাটের রেলিংএ ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। ক্লান্ত লাগছে। আর কেমন একটা যাতনাও। কিন্তু ভিতরের বিক্ষোভ আরো বেশি। নিশানাথ এলো। অদূরে একটা চেয়ার টেনে বসে হাই তুলল।

ঊর্মিলা শান্তমুখে জিজ্ঞাসা করল, সারা দুপুর ঘুমুলে?

হ্যাঁ।

এখানে ঘুম হ'ত না?

নিশানাথ জবাব দিল, না।

একটু বাদে ঊর্মিলা আবার প্রশ্ন করল, যা শিখতে গেছলে শেখা হয়ে গেছে?

না। শেখার কি আর শেষ আছে...? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

কোথায় যাচ্ছ?

ঘুরে আসি।

দাঁড়াও। ঊর্মিলার মুখে বিকৃত রেখা পড়ে গেল।—বোসো, আমার কিছু শোনবার আছে।

নিশানাথ তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

পরে হাল্কা জবাব দিল, তাড়া কিসের—আপাততঃ আমি আছি এখানে।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই শৈলবালার ঘরের পাশ দিয়ে চলল সে। কিন্তু এবার আর কারও কণ্ঠস্বর কানে এলো না। কি ভেবে ঘরে ঢুকল। শৈলবালা মেঝেতে একাই বসে ছিলেন। উঠে একটা আসন পেতে দিতে গেলেন।

নিশানাথ বলল, না বসব না এখন, এদিক দিয়ে আসতে তখন শশাঙ্কর গলা শুনলাম যেন, চলে গেছে?

শৈলবালার কণ্ঠস্বর মৃদু শোনাল।—এই তো গেল।

নিশানাথ হাসতে লাগল। বলল, বাড়ি এসেও জাপান-ফেরত মূর্তিটি দেখা গেল না!

কোন রকম শ্লেষ সহ্য করাটা ধাতে নেই শৈলবালার। বললেন, আমি দেখা করে যেতে বলেছিলাম তাকে। বলল, গরজ থাকে তো তুমি তার বাড়ি গিয়ে দেখা কোরো, তার অত সময় নেই।

হুঁ? হাল্কা বিস্ময়।—কিন্তু যাবার সময় তো কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে দেবারও সময় ছিল।

শৈলবালা এবারে চুপ। শশাঙ্ক নিশানাথকে কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল ঊর্মিলার চলনদার হিসেবে। তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে সে ঊর্মিলাকে নিয়ে মহেশপুরে ফিরেছে।

সেদিন রাত্রিটাও সদরে কাটালো নিশানাথ। পরদিন সকালে ঊর্মিলা শুনল, খুব ভোরে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে সে। তাকে জানায়নি কিছু। মা এবং বৌদিকে নাকি বলে গেছে। কিন্তু তাঁরাই এসে ওকে নানা ভাবে জেরা করতে লাগলেন। হঠাৎ কলকাতায় তার এমন কি জরুরী কাজ পড়ল। আজ বাদে কাল একটা শুভ কাজ, অথচ ছেলে এত দিন বাদে বাড়ি এসে জেনে-শুনেও চলে গেল! ছেলেকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আটকাতে চেয়েছেন। কিন্তু তার দিকে চেয়ে বেশি কিছু বলতে সাহস পাননি। ঊর্মিলার কাছে এসে ব্যাকুল

হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বলো তো বৌমা, আমার যেন কিছু ভাল লাগছে না।

উর্মিলা জবাব কি দেবে। তার বেদনা-বিবর্ণ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল শুধু।

সেদিন গেল। পরদিন তাকে নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল নিমন্ত্রিতা এয়োদের মধ্যে। উঠতে বসতে কষ্ট হচ্ছে। ভেতরের যাতনাটা বেড়ে চলেছে। তবু কলের মত তাকে উঠতে হচ্ছে বসতে হচ্ছে। কথা বলতে হচ্ছে। এমন কি একটু-আধটু হাসতেও হচ্ছে। উৎসব মিটতে বিকেল গড়িয়ে গেল। শরীরের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল এক প্রস্থ। উর্মিলা দাঁড়াতেও পারছে না আর। সন্ধ্যা হতে না হতে শয্যার আশ্রয় নিল।

খানিক বাদে শৈলবালা এলেন। উর্মিলার ক্লেশটুকু অনেকক্ষণ ধরেই উপলব্ধি করছিলেন তিনি। কপালে হাত রাখলেন। গায়ে তাপ উঠেছে। উর্মিলা চোখ মেলে তাকালো। পরে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো।

নিশানাথ কলকাতায় এসেছে। কিন্তু অকারণে নয়। বিদেশ থেকে ফিরে মহেশপুরে যাবার মুখে কলকাতার তিনটি নাম করা মেডিকেল ক্লিনিকের সঙ্গে সে যোগাযোগ করে গিয়েছিল। এখন রিপোর্টগুলো নিতে হবে। আগেও অনেকবার নিয়েছে। কিন্তু শেষ বারের মত নিঃসন্দেহ হওয়া ভালো। এক জায়গা থেকে নয়, তিন জায়গা থেকে।

রিপোর্ট সংগ্রহ হল। না, ভুল নেই। ভুল থাকবে না জানা কথাই। বিদেশেও নামী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নিয়েছে। এবারেও তিনটে রিপোর্ট থেকে সেই একই তথ্য আহরণ হল।

···সন্তান-সম্ভাবনা নেই তার।

···তবু বংশধর আসছে !

এই বার নিশানাথ ধীরে-সুস্থে কাজের কথা ভাবতে লাগল। কি করবে সে? কিছু একটা করবেই।···কিন্তু কি করবে?

তিন দিন বাদে মহেশপুরে পৌঁছেও ঠিক করতে পারল না কি করবে। পশুপতিনাথের ছেলে সে। একেবারে নির্মূল করে দেবে বংশধর-বহনকারীনিকে সুদ্ধ? কিন্তু তার পরেও বাকি থাকে। বাকি থাকে শশাঙ্ক। তাকে কি করবে?···গুলী করে মারবে?···জীবন্ত পুঁতবে? হঠাৎ নিশানাথের মনে হল যেন অন্য রকম রক্ত বইছে তার ধমনীতে। পশুপতিনাথের রক্তে বুঝি মরচে পড়েছিল এতকাল !

সাক্ষাৎমাত্রে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঊর্মিলা বলে উঠল, এসবের অর্থ কি, আমি জানতে চাই?

উঠে বসার ক্ষমতা নেই। জ্বরও ছাড়েনি। কাঁপছে থর-থর করে। শরীর বিষিয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। তবু উঠে বসল, মাথা সোজা রাখল।

নিশানাথ শান্ত। দেখছে। কুৎসিত, বীভৎস। এই নারীদেহ সে ভালোবেসেছিল একদিন! আশ্চর্য !

কি জানতে চাও, বংশধর আসছে শুনেও আনন্দে লাফালাফি করছিনে কেন?

আনন্দ যে হয়নি তোমার দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন হয়নি? চাওনা তুমি?

ঊর্মিলা যেন একটা পথ দেখিয়ে দিল নিশানাথকে। হ্যাঁ, সন্তান সে চায় বই কি। সন্তান চায়, বংশধর চায়। যে আসছে আসুক। নিশানাথের সন্তান। দত্ত-বাড়ির বংশধর। সে থাকবে।···কিন্তু ঊর্মিলা থাকবে না। আর থাকবে না শশাঙ্ক।

হিংস্র আনন্দে নিশানাথ মুখ তুলে তাকালো। সে দিকে চেয়ে ঊর্মিলা অকস্মাৎ ভয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল যেন। মানুষের এমন শ্বাপদচক্ষু আর কখনো দেখেনি।

পরদিন খুব সকালেই নিশানাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, এমনি। কিন্তু এক সময় কি ভেবে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরল সে।

শশাঙ্ক বাড়িতেই ছিল। নিশানাথকে দেখে কোনরকম অভ্যর্থনা না করে নীরবে তাকালো।

নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসল নিশানাথ। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, তুমি বউদিকে বলে এসেছ শুনলাম গরজ থাকলে যেন বাড়ি এসে দেখা করি। গরজ আছে।—তোমার কিছু ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে। সেটা দেব। আর আমার কিছু কৈফিয়ৎ পাওনা আছে···সেটা নেব।

শশাঙ্ক এবারেও একটি কথাও বলল না।

নিশানাথ বলল, আমি যখন ছিলুম না, শুনলাম তুমি তখন আমার স্ত্রীর খোঁজ-খবর করেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, ওষুধ-পত্র এনে দিয়েছ, ধন্যবাদটা সেই জন্য।

শশাঙ্কর মুখে ক্রোধের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু চুপচাপ অপেক্ষা করে সে।

নিশানাথ একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, জাপানে থাকতে তোমার একটা চিঠি পেয়েছি। স্ত্রীর প্রতি আমার কর্তব্যে ত্রুটির জন্য অভদ্র অপমানকর চিঠি লিখেছ। পশুপতিনাথের ছেলে কারো গালাগালি শুনে বা গরম চক্ষু দেখে অভ্যস্ত নয়। এর জবাব দিতে হবে।

শশাঙ্কর চোখের সমুখে হঠাৎ যেন একটা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। দিদি সে দিন তাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার জন্য আকুতি মিনতি করেছিলেন। আর নিশানাথের দিকে চেয়ে তার মনে হল, দিদি ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন তার নিজের কোনো অশান্তির কারণে নয়, এই লোকটার হাত থেকে তাকেই রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু কেন! কিন্তু কেন? তীক্ষ্ণধী মানুষটির কাছে কি একটা আভাস যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। চেয়ে আছে, দেখছে।

ধীরে-সুস্থে বলল, জবাব যদি দিই, প্রবল-প্রতাপ পশুপতিনাথের ছেলের কি সেটা ভালো লাগবে? আমার একমাত্র জবাব হতে পারে, ওই যে বাগানে চাকরটা আর দুটো মালী কাজ করছে, তাদের ডেকে পশুপতিনাথের ছেলেকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে বলা।

নিশানাথের চোখে সেই হিংস্র আগুন জ্বলে উঠল আবার। মনে হল, এক্ষুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে মানুষটাকে। কিন্তু সামলে নিল।—নিঃশব্দে উঠে চলে গেল তারপর।

অন্দর মহলে প্রথমেই শৈলবালার সঙ্গে দেখা। বলল, শশাঙ্কর সঙ্গে দেখাটা করে এলাম।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন শৈলবালা। নিশানাথ পাশ কাটালো। হাসছে মনে মনে। সত্যটা শৈলবালার কাছেও গোপন নেই তাহলে! কুশাগ্র-বুদ্ধি শৈলবালার।

কি ভেবে ফিরে এলো নিশানাথ। বাইরের ঘরে এসে আরাম কেদারায় গা ছেড়ে দিল। ঊর্মিলার সামনে এ সময়ে যাওয়া উচিত নয়। একটা কিছু করে ফেলতে পারে। ওর নীল আগুন ক্রমশঃ যেন মাথার দিকে উঠছে। হত্যা করতে হবে। মাথায় হত্যার জল্পনা-কল্পনা চলছে সেই থেকে। ঊর্মিলা হাতের মুঠোতেই আছে। কিন্তু শশাঙ্ক? বিগত দিনের শিকার-পর্বে গুলীতে কাঁধের ব্যাগ ফুটো করে দেওয়া, আর ওর সেই ঠোঁট-কাঁপুনির দৃশ্যটা মনে পড়তে নিশানাথের হাসি পেল। নির্মম ক্রুর হাসি।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে সচকিত হল। তার মা হাউ-মাউ করে এসে কেঁদে পড়লেন।—হ্যাঁ রে, বউটাকে কি মেরে ফেলবি? কি হল তোর? ওদিকে যে অজ্ঞান হয়ে আছে সেই থেকে সারা অঙ্গ নীল বর্ণ।

শুনে নিশানাথ নিস্পৃহ মুখে বললে, ডাক্তারকে খবর দিতে বলো।

হা রে পোড়াকপাল, ডাক্তার কি আর এখানে! শশাঙ্ককে খবর পাঠিয়েছি এক্ষুনি তাকে ধরে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু কি হবে, পেটের সন্তান বাঁচবে তো? তোর কি হল? তুই একবার এসে দেখে যা না?

শশাঙ্ককে ডাক্তার ডেকে আনার জন্যে খবর দেওয়া হয়েছে শুনেই

নিশানাথ গর্জে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু পরের কথাগুলো কানে যেতেই সে তড়িত-স্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল। ঊর্মিলা যায় যদি যাক। একটা হত্যার দায় কমবে। কিন্তু যে আসছে তার না বাঁচলে নয়।

তৎক্ষণাৎ অন্দর মহলে এলো। শয্যায় চোখ বুজে পড়ে আছে ঊর্মিলা। শৈলবালা চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। নিশানাথ তাড়াতাড়ি আর একজন কর্মচারীকে ডাক্তারের কাছে পাঠালো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তার এলেন। নিশানাথ লক্ষ্য করে দেখল, তিনি একাই এসেছেন, সঙ্গে শশাঙ্ক নেই। কিছুক্ষণ বাদে রোগিণী পরীক্ষা করে চিকিৎসক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। নিশানাথের নীরব প্রশ্নের জবাবে শুধু বললেন, এক্ষুণি ঘুরে আসছেন। গাড়িতে উঠে তীর বেগে প্রস্থান করলেন তিনি। ফিরলেন আরো ঘণ্টাখানেক পরে। কিন্তু একা নয়। শহরের একজন নামজাদা সার্জেনকে সঙ্গে নিয়ে।

একসঙ্গে আবার রোগিণী দেখলেন তাঁরা। তাঁদের কথাবার্তা তুর্বোধ্য লাগছে নিশানাথের। শেষে তাকে আড়ালে ডেকে তাঁরা যা বললেন, তার মর্মার্থ—এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে, পেটে যা আছে সেটা সন্তান নয়, জরায়ুতে টিউমার জাতীয় কিছু। ঠিক শিশুর মত সেটা আস্তে আস্তে বাড়ে, আর অনেক লক্ষণই হুবহু মিলে যায়। বিশেষ করে, রোগিণীর সন্তান-কামনা বেশি হলে এ লক্ষণগুলো আরো সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ রোগ হলে প্রথম কিছু কাল পর্যন্ত চিকিৎসকেরও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রোগিণীর প্রথম যখন জ্বালা-যন্ত্রণা সুরু হয়, তখনই খবর দেওয়া উচিত ছিল। বাঁচার আসা কম, তবে এখনো একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

নিশানাথ কি শুনছে, কোন্ প্রস্তাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিচ্ছে, কিছুই হুঁস নেই।...আবার এক সময় দেখল, গাড়ি বোঝাই যন্ত্রপাতি এলো। ডাক্তার ছাড়াও সহকারী এলেন তু'জন, তু'জন নার্সও। দেখতে দেখতে তার ঘরটার ভোল বদলে গেল যেন। ডাক্তার প্রস্তুত হলেন। সহকারীরা প্রস্তুত হলেন। নার্সরাও প্রস্তুত। অপারেশান করবেন যে

সার্জেন তিনি এবার ইশারায় নিশানাথকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু ঘরের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশানাথ। অপর ডাক্তার এসে অনুরোধ করলেন। সে নড়ল না। ডাক্তার সার্জেনের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললেন কি যেন।

নিশানাথ বিমূঢ় নেত্রে দেখছে চেয়ে চেয়ে। উর্মিলাকে ধরাধরি করে টেবিলে তোলা হল। অসময়ে যাতে জ্ঞান ফিরে না আসে সম্ভবত সেই ব্যবস্থা হচ্ছে এখন।···সার্জেনের হাতে একটা ঝক্‌ঝকে ছুরি ঝক-মকিয়ে উঠল। তার পরেই দু'চোখ বুজে ফেলল নিশানাথ। ছুরিটা সমূলে যেন তারই দেহে বিদ্ধ হয়ে জঠর-দেশ দু'খানা করে চিরে দিয়ে গেল। অব্যক্ত যাতনায় চোখ মেলে তাকালো সে। টেবিলে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে! উন্মুক্ত, বীভৎস দৃশ্য! সার্জেনের আচ্ছাদনে ঢাকা মোটা মোটা হাত দুটো যেন রক্তে অবগাহন করছে।

নিশানাথের গা ঘুলিয়ে উঠল। পা টলছে। মাথা ঘুরছে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এসে রেলিংএ মাথা রাখল। অনেকক্ষণ পড়ে রইল তেমনি। মাথা তুলল আবার। কিন্তু পিছন ফিরে ঘরের দিকে তাকাবার সাহস নেই আর। এক'পা দু'পা করে সামনের দিকে এগোলো সে।

কিছুক্ষণ।

যেন বহুক্ষণ। আত্মবিস্মৃতের মত নিশানাথ এ-ঘর ও-ঘর করছে। মায়ের ঘরে গেল। প্রণামের ভঙ্গীতে উবুড় হয়ে পড়ে আছেন তিনি। নিশানাথ বেরিয়ে এলো। শৈলবালার ঘরে গেল। পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন তিনি। ওকে দেখে আর এক দিকে মুখ ফেরালেন। নিশানাথ বেরিয়ে এলো। নিজের অজ্ঞাতেই সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে এলো সে।

উঠোনের একপাশে শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে।

এগিয়ে গেল। কাছে। আরো কাছে। খুব কাছে। একেবারে তার বুকের কাছে। হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে সবলে আঁকড়ে ধরে ওর কাঁধে মুখ গুঁজে ছোট ছেলের মত ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

ও দিকে শশাঙ্কও চোখে ঝাপসা দেখছে সব কিছু।

করিডোরে কতগুলো পায়ের শব্দ শুনে সান্ত্বনা সেন হিসেবের খাতা বন্ধ করে ফেলে দরজার দিকে তাকালো। প্রথম মহিলার দর্শন মাত্রে দু'চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়, আমি তারই লাগি পথ চেয়ে রই পথে যে জন ভাসায়।'

সমবেত হাসির শব্দে পুরুষ-কণ্ঠ কানে আসতে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে সান্ত্বনা চোখ মেলে তাকালো। চার আঙ্গুল জিব কেটে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারপর। পুরুষ একজন নয়, তিনজন। ইঞ্জিনিয়ার দত্তগুপ্ত, প্রফেসর রে, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার নন্দী।

প্রিয় বান্ধবী মঞ্জুশ্রী দত্ত কল-কণ্ঠে বলে উঠল, আর বসে থাকতে হবে না, সর্বনাসের তেরস্পর্শ একেবারে ঘরের ভেতরে হাজির, এঁরা এবারে তোমাকে পথে ভাসাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছেন, অতএব তুমি স্যুটকেস আর হোল্ডঅল গুছিয়ে প্রস্তুত হও।

মঞ্জুশ্রী রেডিও আপিসে শুধু চাকরি করে না, প্লেও করে। অদূর ভবিষ্যতে চিত্র পরিবেশকের সুপারিশে কোনো ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাতারাতি যশস্বিনী হবার উষ্ণ আসা মনে মনে পোষণ করছে। (নন্দীর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা শুধু এই জন্যে, নইলে আসল চোখ দু'টো তো তার দত্তগুপ্তকেই আঁকড়ে আছে)। সান্ত্বনার লজ্জাভিনয়টুকু নিখুঁত বলেই পীড়াদায়ক ঠেকল। জেনেশুনেই অমনটা করল জানা কথা। কিন্তু ওতে প্রায় পুরুষেরই মুণ্ডু ঘুরবে সে-ও জানা কথাই।

স্মিত হাস্যে সান্ত্বনা আপ্যায়ন করল সকলকে, বসুন, বসুন—। ছদ্ম-কোপে মঞ্জুশ্রীকে চোখ রাঙালো, তুমি ভারী যাচ্ছেতাই তো!

এমন সব গণ্যমান্য অতিথি নিয়ে আসছ, বাইরে থেকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে আসতে হয়, আমি কি করে জানব—

চোখ টাটালেও মঞ্জুশ্রী বান্ধবীর গুণানুরাগিণী। সাদা কথায় অনুগ্রহ প্রত্যাশিনী। জবাব দিল, ওয়ার্নিং দিয়ে এমন লজ্জারক্ত দৃশ্য থেকে গণ্যমান্য অতিথিদের বঞ্চিত করলে আমার নরকেও ঠাঁই হত না। ঠিক না মিঃ দত্তগুপ্ত ?

দত্তগুপ্ত মাথা ঝাঁকালো।—ঠিক। কিন্তু এ সময়ে আপনাকে চড়াও করে বিরক্ত করলাম না তো? করছিলেন কি, হিসেব দেখছিলেন নিশ্চয় ?

ছোট টেবিলে মার্কামারা মোটা লাল খাতাটার ওপর চোখ গেল সকলের। নন্দী বলল, 'রেস্ট হাউস' আপনাকে আর এক মুহূর্ত রেস্ট দিলে না। এবার বিদ্রোহ। আমাদের আরজিটা আপনিই পেশ করুন মঞ্জুশ্রী দেবী।

আরজির সাফল্যের প্রতি মঞ্জুশ্রীর বেশ আগ্রহ আছে দেখা গেল। বলল, পথে ভাসবার জন্য সান্ত্বনা পথ চেয়েই আছে এ আপনারা না ভুললেই হল। এর পরে আর কোনো অজুহাতে ছাড়ন-ছোড়ন নেই।

প্রোফেসার রে বাক নিঃসরণের সুযোগ পাচ্ছিল না। কলেজের মাস্টার, দত্তগুপ্ত এবং নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সান্ত্বনার কাছ ঘেঁষা তার কর্ম নয়। অত বড় আশাও রাখে না। চাকুরে মেয়ে মঞ্জুশ্রীকে পেলেই সে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেতে পারে। এবারে উসখুস করে উঠল, রাইট! সেটা ভুললে কাব্যে উপেক্ষিতার মত হবে।

সঙ্গীদ্বয়ের ঠাণ্ডা চোখে চোখ পড়তে সে আবার চুপসে গেল। সান্ত্বনা এদের বক্তব্যটা সঠিক বুঝে উঠল না। বলল, কি ব্যাপার ঘাবড়ে যাচ্ছি যে! আচ্ছা পরে শুনব, আগে একটু চা হোক।

দত্তগুপ্ত লাফিয়ে উঠল, শুধু চা হবে মানে? চায়ের সঙ্গে অনেক কিছু হবে। কিন্তু এখানে কিচ্ছু হবে না। নিজেদের অমন জায়গা থাকতে এখানে চা খেতে যাব কেন! তা' ছাড়া, উই ওয়ান্ট ইয়োর

আনকন্‌ডিশনাল সারেণ্ডার। চলুন রেস্ট হাউস-এ, সেখানে আমাদের আরজি নিয়ে আপনার সঙ্গে দস্তুর মত ফাইট চলবে।

সবার আগে মঞ্জুশ্রী সমর্থন-সূচক হাত তুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলেরও হাত উঠল। এবং এ'কে এ'কে উঠেও দাঁড়াল সকলে। সান্ত্বনা মৃদু মৃদু হাসছে।—বেশ, রাজি আছি চলুন। কিন্তু এক্‌ সর্তে। আজ সবাই আপনারা অতিথি, রেস্ট হাউসের বিল্‌ পাবেন না।

মঞ্জুশ্রী এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবে না। ধুপ করে আবার সে সোফায় বসে পড়ল।—আমি রাজি নই, তোমরা যাও তাহলে। বিজনেস্‌ ইজ বিজনেস্‌, সেটা তোমার বলে তুমি যা খুশি করতে পারো না। বিশেষ করে আমি যখন জানি কত বড় নিয়ম নিষ্ঠার্‌ ফলে রেস্ট হাউস আজ দাঁড়াবার মত দাঁড়িয়েছে। আজকের পার্স আমার—

চিত্র-পরিবেশক নন্দী উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, আমরাই কি দেব নাকি ওঁকে অমন অবিচার করতে, নিজেরা ব্যবসা করছি আর ব্যবসার মর্ম বুঝিনে। কিন্তু তা বলে আপনি কেন, এ নিয়ে দত্তগুপ্তর সঙ্গে আমার বরং হাতাহাতি হতে পারে।

দত্তগুপ্তও তেমনি সায় দিল, এক্‌জ্যাকটলি সো, এবং আমার লোহা-পেটা শরীর, তুমিও মানে মানে এখান থেকেই হার স্বীকার করে নাও। চলুন, আর দেরি নয়, আসল কথাটাই এখনো বাকি।

মঞ্জুশ্রীই হাসি মুখে অগ্রবর্তিনী হল এবার। রেস্ট হাউসের প্রতি এমনি অবিমিশ্র দরদে কর্ত্রীর মন কতটা ভিজল সেটা তার পক্ষে আঁচ করা শক্ত নয়। রেস্ট হাউসের অংশীদার, অন্যথায় ওয়ার্কিং পার্টনার হতে পারাটা বর্তমানের চরম লক্ষ্য। অনেক দিন ধরেই এই আমন্ত্রণের প্রত্যাশায় আছে।

দত্তগুপ্ত এবং নন্দীর মোটর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনার গাড়ি বার করবার দরকার নেই। নিজের ড্রাইভারকে যথাসময়ে হাজিরা দেবার নির্দেশ দিয়ে সে তাঁদের একজনের গাড়িতে গিয়ে বসল।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে হুজুরাণীকে সদলবলে আসতে দেখে

কোট-প্যাণ্ট পরা ম্যানেজার থেকে তক্‌মাপরা বেয়ারা-খানসামা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে পড়ল। রেস্ট হাউসের মাইনে বেশি কিন্তু চাকরি যেতে সময় লাগে না। একটুকু ত্রুটি ঘটলে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করে দেওয়াই রীতি।

দোতলার বড় ক্যাবিনে সকলকে বসতে বলে সান্ত্বনা সেন এক নজরে চতুর্দিক দেখে নিল। ছুটির দিনে এরই মধ্যে ভিড় মন্দ হয়নি। এ-কোণ ও-কোণ থেকে দু'চার জন মুখচেনা ধনীর দুলাল একটুখানি প্রসন্নতা বর্ষণের আশায় বার বার উৎসুক-নেত্রে তাকাতে লাগল। বঞ্চিত হল না। দূর থেকে পরিচয় সূচক কটাক্ষের উষ্ণপুলকে চায়ের স্বাদ বদলে গেল তাদের। নিচের ছোট ক্যাবিনগুলোর বেশির ভাগই পরদা-টানা। ফাঁকে ফাঁকে যুগ্ম দয়িতের আভাষ মেলে। মৃদু হাসি, মৃদু গুঞ্জন, আর মৃদু-মৃদু ঠুনঠান। অদূরে একজন তরুণ লেখক বেপাড়ার সঙ্গী নিয়ে গল্পের প্লট সংগ্রহ করতে এসেছে। সঙ্গীর নির্বাক্ দৃষ্টি অনুধাবন করে মুচকি হেসে বলল, দেখো, কিন্তু চোখ দিও না।

চোখ আপনি যাচ্ছে, মহিলা কে?

ট্যাণ্টেলাস কাপ। গলা জলে ডুবলেও জল-তেষ্টায় মারা যাবে।

কর্ত্রীর আগমনে কায়দা-দুরস্ত ম্যানেজার মোটা গদির চেয়ার ছেড়ে খদ্দেরের কাছে ঘুরে ঘুরে অমায়িক তদবির-তদারকে লেগে গেছে। বেয়ারারা এরই মধ্যে নিজ এলাকার খালি টেবিলগুলোও একাধিক বার ঝাড়ামোছা করে ফেললে। সান্ত্বনা নিজের চেম্বারে প্রবেশ করল। কোনো কাজে নয়, এমনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ভেতরের দরজা দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

দত্তগুপ্ত সকলের মতামত নিয়ে মেনু পাস্ করে দিয়েছে। উৎফুল্ল মুখে আহ্বান জানালো, আসুন—আমরা ভাবলুম আবার নিচে গিয়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করে আনতে হবে।

সান্ত্বনা সেন বসল। প্রোফেসর রে এবং মঞ্জুশ্রীর মাঝের চেয়ারে। নন্দী বিরক্ত হল অধ্যাপকের উপর, পাশের চেয়ারটিতে তার সরে যাওয়া

উচিত ছিল। আর দত্তগুপ্ত ভাবল, মঞ্জুশ্রী ইচ্ছে করেই জায়গাটা ছেড়ে দিলে না। মাঝখান থেকে রে আড়ষ্ট হয়ে গেল একটু।

সান্ত্বনা বলল,—নিন, এবার আমাদের বক্তব্য শোনান।

মঞ্জুশ্রী সুরু করল, বক্তব্যটা তোমার কানে নীরস লাগবে কিন্তু।

দত্তগুপ্ত বলল, শুধু একঘেয়ে কাজের অপকারিতা সম্বন্ধে আগে ছোট-খাট একটা বক্তৃতা করে নিতে পারলে হত। ওহে রে, ওটা তোমার জুরিসডিকশান্, একবার দেখ না চেষ্টা করে, বাড়িতে তো হোমিওপ্যাথি দু'চার ফোঁটা করো শুনেছি।

হাসতে চেষ্টা করে রে আরো বেশি হাসালো সকলকে। কিন্তু ইতি-মধ্যে ক্যাবিনের পর্দা নড়ে উঠল। বড় বড় দুটো ট্রে হাতে দু'জন বেয়ারা পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সন্তর্পণে তারা টেবিলে খাবারের ডিস সাজিয়ে দিয়ে গেল। দত্তগুপ্ত জিভে একটা শব্দ করে সাড়ম্বরে বড় নিঃশ্বাস টেনে সবটা সুঘ্রাণ আস্বাদন করে ফেলল যেন।—আমাকে এখানেই একটা চাকরি দিন না সান্ত্বনা দেবী, সব ছেড়ে-ছুড়ে কাটলেট কামড়ে পড়ে থাকি।

হাসির শব্দে ঘর ভরে গেল।

সান্ত্বনা জবাব দিল, ওই বাইরে থেকেই, একবার ভেতরে এলে আর পালাতে পথ পাবেন না। অতঃপর আহার সংযোগে নানা ভণিতার মধ্য দিয়ে এদের আসল সঙ্কল্পটার মর্মোদ্ধার করল সে। কথা আর কিছুই নয়, দিন কতকের জন্যে সকলে মিলে প্লেজার ট্রিপে বেরুবে কোথাও। একঘেয়ে কাজের চাপে জীবন একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠেছে নাকি।

দু'চোখ কপালে তুলে ফেললে সান্ত্বনা, কিন্তু আমি বেরোই কি করে!

দত্তগুপ্ত শক্ত হাতে হাল ধরলে, কেন আপনি কি একেবারে দাসখত লিখে দিয়েছেন রেস্ট হাউসের কাছে যে দু'দণ্ডও বিশ্রাম পাবেন না? আমার লোহালক্কড় পেটা শরীর তাতেই হাঁপ ধরে গেল, আর আপনার তো—

কথাটা আর শেষ হল না। নন্দী মুখের মাংসখণ্ড জঠরে চালান করে আবেদনের স্থতো ধরল।—মোটা মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার, কর্মচারী সব রেখেছেন, দরকার হলে ক'টা দিন তারা চালিয়ে নিতে পারবে না সেও তো ভাল কথা নয়। পারে কিনা দেখার জন্যেই তো আপনার মাঝে মাঝে গা ঢাকা দেওয়া উচিত।

রে এবং মঞ্জুশ্রীর কান খাড়া থাকলেও হাত ও মুখের অবকাশ নেই। তবু স্থযোগের প্রতীক্ষায় আছে মঞ্জুশ্রী দত্ত। সমস্যা সমাধানে অগ্রবর্তিনী হল এবার। বলল, এ ভাবে সব ফেলে রেখে সান্ত্বনার পক্ষে যাওয়া অবশ্য শক্ত। বারো ভূতের কারবার, কে কি করে বসে থাকবে ঠিক নেই। স্থনাম একবার গেলে তো সব গেল···কিন্তু এমন করে এঁরা যখন ধরেছেন তোমার যাওয়াই উচিত সান্ত্বনা। তা ছাড়া সত্যিই রেস্টও দরকার। আমি তো আছিই, যতটা পারি দেখাশুনা করব'খন দুবেলা—তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে এসো দিন কতক।

সে যে যাচ্ছে না দলের সঙ্গে এটা শুধু সান্ত্বনা নয়, অন্য সকলেও এই প্রথম শুনল এবং বিস্মিত হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করে ফেলল, আপনি আছেন মানে?

মঞ্জুশ্রী অল্প হেসে ভুরু কোঁচকালো।—বা রে, আমার চাকরি আছে না? তা ছাড়া দু'জন গেলে চলে না শুনছেন তো?

সান্ত্বনা প্রথমে যতই আকাশ থেকে পড়ুক, সদলবলে দিনকতক কোথাও বেড়িয়ে আসার প্রলোভন একেবারে এড়াতে পারল না। রেস্ট হাউস ফেঁদে বসার পর থেকে কোথাও আর বেরুনো হয়ে ওঠেনি। মঞ্জুশ্রীর কথার জবাবে একটু ভেবে প্রায় স্বীকৃতির আভাস দিয়ে ফেলল।—তোমাকে এই ঘানিতে লাগিয়ে দিয়ে আমি বুঝি ফুর্তি করতে বেরুবো, গেলে সবাই একসঙ্গেই যাব, এখানকার কাজ এরাই চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু, কোথায় যাবেন আপনারা?

দত্তগুপ্ত এবং নন্দী সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। এমন কি রে-ও সানন্দে যোগ দিল তাতে। আর আসল উদ্দেশ্যই যখন ভেস্তে গেল, মঞ্জুশ্রী

চাকরির দায়িত্বের প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করাটাও সমীচীন বোধ করলে না। এবারে স্থান নির্বাচনের সমারোহ। নন্দী প্রস্তাব করলেন, অজন্তা এলোরা পর্যন্ত টার্গেট করে নিয়ে চলুন বেরিয়ে পড়ি। শুনে রে'র মুখ শুকালো সবার আগে। তার ধারণা ছিল, প্লেজার ট্রিপ বলতে হাজারি-বাগ রাঁচী নয় তো ভুবনেশ্বর পুরী! এবং এও ভেবে রেখেছে, কপাল ঠুকে জমানো টাকা নিঃশেষ করে মঞ্জুশ্রীর খরচার ভারও সবটা বহন করে দেখবে কপাল ফেরে কি না। কিন্তু এ যে তার নিজেরই যাওয়া দায় হয়ে উঠল। ও দিকে মঞ্জুশ্রীরও একই অবস্থা।

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার দত্তগুপ্ত অজন্তা এলোরা এক কথায় নাকচ করে দিলে।—ওসব কাব্য আমার ভাল লাগবে না। তার থেকে চলো গোয়া-লিয়র-ঝাঁসি—একেবারে ইতিহাসের খট্‌খটে মরুভূমি। একটু কষ্ট করলে জয়পুরও সেরে আসা যায়।

ফুটন্ত তেলের কড়া আর জ্বলন্ত আগুন দুই-ই সমান। রে এবং মঞ্জুশ্রী নিস্পৃহ মুখে পুডিং নাড়াচাড়া করতে লাগল। সান্ত্বনা মনে মনে প্ল্যান ছকে ফেলেছে।···বেরুবেই যখন, সেই লোকটার কালো মুখ আরো কালি করে দিয়ে আসা যাক না কেন? মনে হতেই একটা নারীসুলভ কৌতূহলও সুপরিস্ফুট হল মুখে। বলল, এরকম বেড়ানোর নাম বুঝি বিশ্রাম! ওতে আমি নেই, তার থেকে বরং লক্ষ্ণৌ চলুন, বেশ ভালো জায়গা।

বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত তাই সাব্যস্ত হল। আলোচনায় দেখা গেল, লক্ষ্ণৌ সত্যিই ভালো জায়গা, বেশ নিরিবিলি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভালো হোটেল আছে, ইত্যাদি। প্রফেসর রে স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলল, নিজের খরচাটা চালিয়ে সঙ্গী তো হতে পারবেই। মঞ্জুশ্রীরও খুব নাগালের বাইরে মনে হল না। শুধু যাতায়াত এবং হোটেল-খরচা। দেখা-শুনা বেড়ানো চা-রেস্তোরাঁর আনুসঙ্গিক ব্যয়ভার সঙ্গীরাই কাড়াকাড়ি ভাগ-বাটারা করে নেবে জানা কথা।

যে কালো মুখ কালি করে দেবার আগ্রহে সান্ত্বনা সেন হঠাৎ লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাওয়া স্থির করে ফেললে, সে দিকে এগোতে হলে কাহিনীর

গোড়ার দিকে খানিকটা পিছিয়ে আসতে হবে। সেই কালো মুখ,অর্থাৎ, শিবদাস সেন ওর দিদির দূর সম্পর্কের দেওর হত। কিন্তু দাদার শালীর সঙ্গে দিদির দেওরের যে সহজাত রোমান্সের সম্ভাবনা ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি গজিয়ে উঠতে পারে, তার ধার-পাশ দিয়েও এরা যায়নি। একই বাড়িতে অনেক দিন কাটিয়েছে, তবু না। তার দু'টো কারণ। প্রথমত, অমন চাষাড়ে গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষের সঙ্গে রোমান্স হয় না। দূরসম্পর্কের দাদার আশ্রয়ে থেকে লোকটা যুদ্ধের আপিসে সামান্য কেরানীগিরি করে দেশে নিজের বিধবা মা-বোনের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করত কোন রকমে। দ্বিতীয়, সান্ত্বনা সেনের টাকার ওজন না থাকুক, নিজের রূপের ওজনটুকু সম্বন্ধে সে ছেলেবেলা থেকেই দিব্বি সচেতন। সেটা ওর দোষ নয়, আর পাঁচজনে এমন করেছে। যখন ফ্রক পরত, পাড়া-প্রতিবেশী বলত, ফুটফুটে মেয়ে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরে হেঁটে ইস্কুলে যাবার সময়ে রোজ ক'টা ছেলেকে টেনে আনছে মেয়ে-ইস্কুলের দোরগোড়া পর্যন্ত, সকৌতুকে সেটা খেয়াল করত। কলেজে ছাত্র এবং তরুণ প্রফেসারদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েও কোন রকমে ঘষেমেজে আই-এ টা পাস করে ফেললে। কিন্তু স্তাবক-পরিকীর্ণ হয়ে আর এগোনো গেল না। পর পর দু'বার বি. এ. ফেল করে পড়াশুনায় ইস্তফা দিলে।

মোটামুটি ঘরে-বরে বিয়ে করতে রাজি হলে তার আত্মীয়-পরিজন অনায়াসে সে ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু সান্ত্বনা আমল দিলে না। কারণ, সেরকম যোগাযোগ থাকলে ওই রূপের জোয়ারে দু'চারজন আই. এ. এস. আই. পি. এস. অন্তত হাবুডুবু খেত, সেটা সে উপলব্ধি করতে পারে। যখন হল না, কাজ নেই বিয়েতে। চাকরির চেষ্টা করবে বলে দিদিকে চিঠি লিখে ছোট শহর কানা করে সে চলে এলো আজব শহর কলকাতায়। দিদি বললেন, ভালো করেছিস, এখনি হাঁড়ি ঠেলতে যাবি কেন, তার চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।

কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়ানও অত সহজ নয়। দরখাস্তর মধ্যে তো আর রূপের কথা লেখা যায় না। বি. এ. ফেল মেয়ের দরখাস্ত বেশির

ভাগই ওয়েস্ট পেপার বাস্‌কেট-এ সমাধি লাভ করছিল। শিবদাস সেন প্রস্তাব করল, কেরানীগিরি করতে যদি রাজি থাকে তো আপিসে চেষ্টা করে দেখতে পারে। যুদ্ধের আপিসে কেরানীর মাইনেও খারাপ নয়।

অভিমানাহত দৃষ্টিবাণে সান্ত্বনা বিদ্ধ করতে চাইলে তাকে।—বেশ! এত দিন পরে বুঝি এই কথা! কোন্ সাম্রাজ্ঞীগিরিটা জুটছে যে কেরানীগিরি করব না?

শিবদাস জবাব দিলে, আমাদের আপিসে সাম্রাজ্ঞীগিরিও করছেন কেউ কেউ, জায়গাটা খুব ভালো না বলেই এতদিন বলিনি।

সান্ত্বনার আগ্রহ চতুর্গুণ হল। ছদ্ম কোপে বলল, ঠাট্টা রাখুন, আমার বলে প্রাণান্ত অবস্থা—আপনি আজই চেষ্টা করুন।

ইণ্টারভিউর দু'দিনের মধ্যে সান্ত্বনার চাকরি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের চাকাও ঘুরল। পাঁচমিশালি নবীন অফিসারদের সমাবেশ সেখানে। বছর না যেতে তাদের মোটরে যাতায়াত, বিলিতি রেস্তোরাঁয় অবকাশ বিনোদন এবং সিনেমা দেখাটা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল। ইতি-মধ্যে দিদির আশ্রয় ছেড়ে একটা বোর্ডিং-এ আলাদা ঘর নিয়েছে।

শিবদাসের গাত্রদাহ সকল সময় চাপা থাকে না। বলে, বেশ আছেন!

সান্ত্বনা হাসে। জবাব দেয়, আছি তো।

কিন্তু সত্যিই সান্ত্বনা বেশ নেই। অন্যের গাড়িতে চড়ে সুখ কতটুকু? তাতে করে চাকরিতে বড় জোর বছরে এক আধটা লিফ্‌ট পেতে পারে; পেয়েছেও। কিন্তু তার বাসনার সাম্রাজ্যে ওটুকু উন্নতির কানাকড়িও দাম নেই।

যার যেমন ভাবনা, তার তার তেমন সিদ্ধি। সান্ত্বনার বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্কে একদিন হঠাৎ যেন এক ঝলক আলোকপাত হয়ে গেল। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে বড় রেস্তোরাঁয় ঢুকে আগে শুধু সকৌতুকে লক্ষ্য করত, সেখান-কার আবহাওয়া খানিকক্ষণের জন্যে বদলে যায়; প্রবেশ-পথে চার দিক থেকে সোজা বাঁকাচোরা কটাক্ষ ছাড়াও মনে হত ক্যাবিন থেকে তার

নিষ্ক্রমণের প্রতীক্ষায়ও অনেকে বসে থাকে শুধু আর একবার চোখের দেখা দেখবে বলেই। এই থেকেই হঠাৎ একদিন ভিতরে একটা সঙ্কল্পের সূত্রপাত দেখা দিল।

তারপর দু'চার দিন সে একা এলো রেস্তোরাঁয়। পরদা দেওয়া ক্যাবিনে প্রবেশ না করে সোজা গিয়ে বসল বাইরের খোলা টেবিলে। দু'এক পেয়ালা চায়ের অবকাশে অন্যমনস্কের মত সময় কাটালো অনেকক্ষণ ধরে। আসল চোখ দু'টো তার ঠিকই সজাগ আছে। খদ্দের আসছে স্বাভাবিক হারেই, বেরুচ্ছে কম।···ওই কোণের টেবিলের চার জন চা দিয়ে সুরু করেছিল, এখন খাবারের অর্ডার দিচ্ছে। সামনের দু'তিনটে লোকের এক পেয়ালা চায়ে তৃষ্ণা মিটল না ,আবার চা ফরমায়েস করল। দু'টো টেবিল পরের ওই অভিজাত তরুণ দলটি পরদা ঠেলে ক্যাবিনে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেন যেন ক্যাবিন পছন্দ হল না তাদের, বাইরেই বসেছে। বয় এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, কিন্তু কি খাবে সে জটলাই শেষ হচ্ছে না তাদের।

সান্ত্বনার ভাবনা ঘনীভূত হতে থাকল। এই প্রথম একজন যোগ্য সঙ্গীর অভাব অনুভব করল সে। শেষে আপিস ফেরতা শিবদাসকেই একদিন সঙ্গে করে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। লোকটা সরলে হলেও নির্বোধ নয়, তার ওপর কাঠগোঁয়ার। কাজে লাগাতে পারলে ভালই কাজে লাগে। বাড়িতে ওকে অনেক বেগার খাটতে দেখেছে।

ভিড় ছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সান্ত্বনা এক সময় বলল, রেস্তোরাঁগুলোয় কেমন বিক্রি দেখছেন···!

শিবদাস ঘাড় নাড়লে, বললে, কলকাতার ব্যাপার—।

কি ছাইয়ের চাকরি করেন, এরকম একটা খুলে বসুন না ?

শিবদাস ভাবল কথার কথা। বলল, এটাই বাকি আছে।

কেন, পছন্দ হল না বুঝি ?—অমন নিশ্চিন্ত কেরানীগিরি করছেন, পছন্দ হবেই বা কি করে !

শিবদাস বিরক্ত হল। বলল, তত্ত্বকথা রেখে চা'টা খেয়ে ফেলুন,

ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা খুলে বসতে যে পুঁজি লাগে সেটা থাকলে কেরানীগিরি করতাম না।

সান্ত্বনা কিছুক্ষণ চুপ-চাপ চেয়ে রইল তার মুখের দিকে, পরে এক নিঃশ্বাসে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে জবাব দিল, আপনার চোখ থাকলে তো পুঁজি চোখে পড়বে—।

বলা বাহুল্য, এবারে শিবদাস বিস্মিত হল। কিন্তু সান্ত্বনা ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

এর পরে হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা গেল। বড় কর্তাদের মোটর-গাড়ি অথবা সিনেমা রেস্তোরাঁর আমন্ত্রণ যেন রাতারাতি জয় করে ফেলল সান্ত্বনা। ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে শিবদাসকে টেনে তুলে তাঁদের নাকের ডগা দিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে আসে। কোনো দিন দিদির বাড়ি যায়, কোনো দিন নিজের বোর্ডিংএ নিয়ে আসে তাকে, কোনো দিন বা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এ ব্যতিক্রম দেখে সকলেই বিস্মিত, শিবদাস নিজেও। অফিসাররা ভাবেন, এ আবার কোন কুগ্রহ এসে উদয় হল। সহকর্মীরা ভাবেন, অমাবস্যা-নিন্দিত মূর্তিটির বরাত বটে!

কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী হল না। ওপরওয়ালার বিষ-দৃষ্টিতে পড়ল শিবদাস। কাজের ত্রুটি ঘটলেই খিটির-মিটির বাঁধতে লাগল। আর ইদানীং ত্রুটি ঘটছেও কাজে। তার ওপর শিবদাসও রগচটা, ফস্ করে দু'এক কথা বলে বসত। ছুটির পরেও কাজ চাপানো হতে লাগল তার ওপর। কিন্তু সান্ত্বনা তাকে এক মিনিটও বেশি বসে থাকতে দেবে না। কাজ ধামাচাপা পড়ে থাকত পরের দিনের জন্য। গাড়িতে প্রতীক্ষারত ওপর-ওয়ালাকে দেখেও দেখে না সান্ত্বনা। শিবদাসের গা ঘেঁষে ডগমগিয়ে গল্প করতে করতে আপিস থেকে বেরিয়ে যায়।

যুদ্ধের আপিসের চাকরি। পেতেও সময় লাগত না, যেতেও না। একদিনের বাক্-বিতণ্ডা এবং সামান্য বচসার পরে শিবদাস একটা নোটিস পেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখল, তার চাকরি গেছে। প্রথমেই সমস্ত রক্ত গিয়ে মাথায় উঠল। তার পরে দেশে বিধবা মা-বোনের কথা

ভেবে অস্থির হয়ে পড়ল। সারা দিন বাড়ি বসে কাটিয়ে ছুটির সময় আস্তে আস্তে আপিসে এল। কিন্তু সসঙ্গিনী বড়কর্তার ঝকঝকে চাকাগুলো যেন তার হাড় পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

এর পরের ছুটির দিনে সান্ত্বনা নিজেই এলো তার সঙ্গে দেখা করতে। নিরিবিলিতেই পেল তাকে। অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করবেন?

শিবদাস জবাব দিলে না।

সান্ত্বনা আবার বলল, হাত পা ছেড়ে বসে থাকলে তো চলবে না, কিছু একটা করা দরকার।

শিবদাস জবাব দিল, ওপরে আপনার দিদি আছেন, সেখানে যান —নইলে কিছু একটা করে বসতেও পারি।

হুঁ, হুঁ—? সান্ত্বনা হেসে উঠল।

শিবদাসের গা জ্বলে যায়। বলল, ওরকম হাসি আপনার সাহেবের জন্যে তুলে রেখে দিন, কাজে লাগবে।···কিছু করবার আগে ওই লোকটাকে হাসপাতালে পাঠাব, সে খবরটাও তাকে দিয়ে দিতে পারেন।

দেব। সান্ত্বনার দু'চোখ স্থির সংবদ্ধ থাকে তার মুখের ওপর। অনেকক্ষণ পরে বলল, তুমি একটি অপদার্থ, চাকরি খেয়েছে বেশ করেছে। পুরুষ মানুষ হয়ে কেরানীগিরির শোকে অমন মাথা খারাপ করতে লজ্জা করে না?

শিবদাস হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল।

সান্ত্বনার কণ্ঠে স্থির আদেশের সুর ফুটে উঠল আবার।—যত দিন না তেমন রোজগার হচ্ছে, তোমার দেশের খরচা আমি চালাব। ব্যবসা করতে হবে। হাজার খানেক টাকা আমার জমেছে, আরো কিছু যোগাড়ের চেষ্টায় আছি। ছোট করে সুরু করাই ভালো—

শিবদাস হাঁ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।—কি ব্যবসা, রেস্তোরাঁ?

সান্ত্বনা মাথা নাড়লে, তাই—। তুমি ঠিকঠাক মত একখানা ঘর দেখে নাও।

তুমিও চাকরি ছাড়বে?

বুদ্ধির বলিহারি! এক্ষুনি দু'জনেই চাকরি ছাড়লে চলবে কি করে? ব্যবসা দাঁড়াক, তোমার ওই চক্ষুশূল সাহেবের গালে চড় বসিয়ে চাকরি ছেড়ে আসব। কিন্তু অমন হাত পা ছেড়ে বসে থাক যদি, জীবনে আর মুখ দেখব না মনে থাকে যেন—

সান্ত্বনা সেন প্রস্থান করল। বিমূঢ় নেত্রে সেদিকে চেয়ে বসে রইল শিবদাস সেন। মানুষটা গোঁয়ার এবং সবল হলেও নির্বোধ নয়, আগেই বলা হয়েছে। কেমন যেন মনে হতে লাগল, তার চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে প্রকারান্তরে এই দেবীটির হাত আছে।

কিন্তু তবু হাত-পা ছেড়ে আর বসে থাকল না শিবদাস। মুখ দেখাবার জন্যে না হোক, মুখ দেখবার তাগিদটুকু ভিতরে ভিতরে অনস্বীকার্য। যুগ্ম জল্পনা-কল্পনা চলল। চলল ঘর দেখা-দেখির পর্ব। শেষে ক্ষুদ্রাকৃতি 'রেস্ট হাউস' এর পত্তন ঘটল এক দিন। ছোট ঘর, স্বল্প আসবাবপত্র, স্বল্প বিধি-ব্যবস্থা। শুধু আশাটাই বড়।

শিবদাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আপিস ফেরতা সান্ত্বনা সটান চলে আসে এখানে। কোনো দিন ছুটি নিয়ে আগেই আসে, কোনো দিন বা আপিস কামাই করে। ছুটির দিনে সারাক্ষণ থাকে। বসে বসে শেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সব কিছু। কিন্তু ঠিক যেন আশাপ্রদ হচ্ছে না।

আপিস থেকে টাকা ধার করে যতটা সম্ভব সাজসরঞ্জাম বাড়ালো, পোশাক পরিচ্ছদ বদলে দিল 'বয়' দুটোর এবং খদ্দেরের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হল সে নিজেই।—আপন মনে বসে চা খাচ্ছে কলেজের তরুণ, তাকে গিয়ে বলল, শুধু চা খান কেন—ওতে লিভাব ঠিক থাকে না, যখনি চা খাবেন আগে একটু কিছু মুখে দিয়ে নেবেন, আমার এখানে বলে বলছি না, সব জায়গাতেই। বয়! বাবু বিস্কুট-টিস্কুট কি নেবেন দেখো। কলেজের তরুণ খাবি খেতে খেতে বিস্কুট খেল। তারপর কাউকে বলল, পুডিং তার নিজের হাতের তৈরী, ব্যবসার ভেজাল নেই তাতে,কাউকে বা সহাস্যে জানালো তার চপ কাটলেটের স্যাম্পেল খাদ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবার বাসনা আছে।

রেস্ট হাউসের ভোল বদলাতে লাগল এবার। প্রথম ইস্কুল-কলেজের ছেলে ছোকরার ভিড়। গুজব শুনে অনেকের অভিভাবক স্থানীয়রা এলেন পরিদর্শন করতে। সেই ছেলেদের আসা খানিকটা বন্ধ হল বটে কিন্তু এঁদের অনেকে আটকে গেলেন। মেয়ে পরিচালিকার কথা শুনে শুভার্থিনী মেয়েরা আসতে লাগল দলে দলে। ফলে ছেলের সংখ্যা চতুর্গুণ বাড়লই।

ছোট ঘর বড় হ'ল। বড় ঘর আরো বড়। বিলিতি ফ্যাশান এবং বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সান্ত্বনা চাকরি ছেড়েছে। শিবদাসের চক্ষুশূল বড় কর্তার গালে চড় মেরে নয়, সেখানকার নানা পার্টিতে খানা সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

কিন্তু রেস্তোরাঁর অতিথিদের প্রতি তার এ সপ্রগল্‌ভ অভ্যর্থনা শিবদাস ঠিক বরখাস্ত করে উঠতে পারত না। ফলাফল হাতেনাতে দেখছে, তবু না। সান্ত্বনা সেটা মনে মনে উপলব্ধি করতে পারে, বিরক্ত হয়, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এক নন্দীর কল্যাণেই তো কত সিনেমার পরিচালক থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীরআনাগোনা। জনাকীর্ণতাসৃজনের বীজাণু তারা, এ সত্যটা আর যেই ভুলুক সান্ত্বনা ভুলবে না। দত্তগুপ্তর মত ইঞ্জিনিয়ার,রে'র মত প্রফেসারের আনাগোনা দরকার রেস্ট হাউসের মর্যাদা রাখবার জন্য। তাছাড়া দত্তগুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কতকগুলো খেলার প্রতিষ্ঠানের, রে'র সঙ্গে কাল্‌চারাল অ্যাসোসিয়েশানের।

অতিথিদের প্রতি সান্ত্বনার অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল শিবদাসকে সচেতন রাখবার জন্যও। তাকে বিশ্বাস করে, ডান হাত বলে মনে করে এখনো। আগে অনেক দিন বিকেলে আপিস থেকে এসে দেখেছে তার তখনো পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। সেই সততার ফল এখন পাচ্ছে, চাইলে আরো বেশি দিতে পারে সান্ত্বনা, আপত্তি নেই। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোনো কটাক্ষ বরদাস্ত করবার পাত্রী নয়, আভাস মাত্রে সেটা সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। তবু শিবদাস বলেই ফেলে, ভালো গোলকধাঁধা বানিয়েছ, একবার ঢুকলে আর বেরুবার পথ নেই।

সান্ত্বনা গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, একটা চোখ আমার দিকে না রেখে দু'টো চোখই নিজের কাজে দাওগে যাও, নইলে গোলকধাঁধা থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়তেও পারে।

পরক্ষণে হেসে ফেলে জবাবের তীব্রতা নরম করে নেয়। তা ছাড়া শিবদাস সঠিক বোঝেওনি। তার এ ঈর্ষা কোন্ প্রত্যাশায় সেটা অবশ্য সান্ত্বনা ভালই জানে, আর সে ঈর্ষা রেস্ট হাউসের নিরঙ্কুশ সফলতার প্রধান অন্তরায়। তাই সেটা অসহ্য আরো বেশি।

শিবদাসকে বিয়ে করার কথাটা কোনো দিনও মনে স্থান দেয়নি সান্ত্বনা। আজও না। যেটুকু অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য আগে ওকে দিয়েছে সে শুধু তাকে সক্রিয় এবং সচল রাখবার জন্য। এখন সে প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়েছে। তা ছাড়া, আপাতত সে কাউকেই বিয়ে করতে রাজি নয়। সারা দেহে ভরা প্রাচুর্যের স্বাভাবিক তাড়নাটুকু অনুভব করে নি এমন নয়। কিন্তু তবু না। কারণ ঈর্ষা বস্তুটা শুধু শিবদাসেরই একচেটে নয়, সবারই এক অবস্থা হবে। বয়স বাড়ছে? বাড়ুক···। আরো টাকা হোক, প্রচুর টাকা,অগুণতি টাকা। তার পর যাকে হোক ডেকে নিলেই হবে।

কিন্তু বিধির ব্যবস্থা অন্য রকম। অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গটা ক্রমশ শিবদাসের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে লাগল। সান্ত্বনার মধ্যেও। সেটা প্রকাশ পেল অন্য ভাবে। কর্মচারীদের প্রতি সান্ত্বনার ব্যবহার খুব দরদী নয়। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে চাকরি যায়। শিবদাস আসে ওদের হয়ে সুপারিশ করতে। ফল হয় না, উল্টে দুজনেরই বিক্ষোভ বাড়ে। এমনি একটা সামান্য উপলক্ষ নিয়েই মর্মান্তিক হেস্ত-নেস্ত হয়ে গেল একদিন।

রেস্ট হাউসের প্রথম আমলের 'বয়' দুটোর একজনের জবাব হয়ে গেছে। অবশ্য অপরাধ তার কম নয়। একদল অতি আধুনিক খদ্দেরকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা এবং পরিবেশন করেও এক পয়সা বখশিষ না পেয়ে বেফাঁস কি যেন বলে ফেলেছিল।

কাজে জবাব হতে কান্নাকাটি জুড়ে দিল সে। তাতে যদি বা কাজ

হত, সান্ত্বনা আরো বিগড়ে গেল শিবদাস সুপারিশ করতে আসায়। বলল, কোনো কথা শুনতে চাইনে, তুমি এবার থেকে ওদের আশকারা না দিলেই খুশি হব।

শিবদাসের রাগ চড়তে ওইটুকুই যথেষ্ট। বসল তার মুখোমুখি। বলল, আর তুমিও কর্মচারীদের ওপর কথায় কথায় অমন দুর্ব্যবহার না করলে আমি খুশি হব।—প্রথম থেকে আছে লোকটা, এক কথায় তাকে যেতে বললেই হল?

সান্ত্বনা কণ্ঠস্বর সংযত করল কোন প্রকারে। ধীরে-সুস্থে পরিষ্কার জবাব দিল, তেমন কারণ ঘটলে প্রথম থেকে আছে এমন ওর থেকে আরো অনেক বড় কর্মচারীকেও যেতে হতে পারে!

শিবদাস হতবাক্।…তার মানে?

বুঝে নাও।

যা ঘটবার ওই সামান্য ক'টি কথাতেই ঘটে গেল। সমস্ত আশা আশ্বাস এক মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল শিবদাসের। নিশ্চল মূর্তির মত বসে রইল অনেকক্ষণ। তার পরে একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

সান্ত্বনা মনে মনে দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু এ রকম একটা দিন আসবে সে জানত। আগে এসেছে, ভালই। ও চাইলে টাকা ছাড়া রেস্ট হাউসের কিছু অংশও তাকে লিখে দিত। কিন্তু মালিকানার সর্তে নয়, কর্ম-পরিচিতির সানুগ্রহ পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু ওতে সে সন্তুষ্ট থাকবে না এও সান্ত্বনা জানতই।

দিদির বাড়ি থেকে খবর পেয়েছে লোকটা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে উত্তর প্রদেশে। সেখানেই একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে হয়ত। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকবার জন্যেই খুব পরিষ্কার করে শিবদাসকে একটা চিঠি লিখেছিল।—কোন্ সম্পর্ক নিয়ে পাশাপাশি তারা এখনো সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে রেস্ট হাউসের সঙ্গে, সে সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস-বিহীন বাস্তব সম্ভাবনা সমন্বিত পত্র।

সে চিঠি শিবদাস পেয়েছে। জবাব দেয়নি। তার চোখের আগুনে প্রতিটি ছত্র যেন পুড়িয়ে ঝলসে ফেলতে চেয়েছে। নির্মম ক্রূরতায় ওই নারী-দেহের হাড়-গোড় সুদ্ধু পিষে তালগোল করে ফেলতে পারলে জিঘাংশু মন শান্ত হত।

এবারে বর্তমানের কাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়া চলে। দত্তগুপ্ত-নন্দী-রে'-অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে হঠাৎ বেড়াতে আসা সাব্যস্ত করে কৌতুক বশেই হয়ত সান্ত্বনা এত দিন বাদে আবার শিবদাসকে চিঠি লিখল।—'লক্ষ্ণৌ বেড়াতে আসছে, পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।' কিন্তু সবটাই হয়ত কৌতুক নয়। ওকে ছাড়াও রেস্ট হাউস বিপুল গতিতে চলতে পারে এটা যদি সে বুঝে থাকে তাহলে এখনো তার ফিরে আসার পথ খোলা আছে, সে উদার আভাসও সান্ত্বনা সাক্ষাতে দেবে। মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রেখেছে, তবু তার কাজের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ এখনো সে ওকেই সকলের ওপরে প্রাধান্য দিতে রাজি আছে। নিজের উদারতা দেখে সান্ত্বনা নিজেই মনে মনে বিস্মিত হল, খুশি হল, তৃপ্ত হল। সে চিঠিও পেল শিবদাস এবং আগের মতই মনে মনে সমস্ত নখ-দন্ত দিয়ে যেন বিদীর্ণ করে ফেলতে চাইল তাকে।

লক্ষ্ণৌ সহরে দ্বিতীয় দিনে হোটেলে সান্ত্বনার সঙ্গে আবার দেখা হল শিবদাসের। তিন বছর পরে দেখা। শিবদাসই এসেছে। সান্ত্বনা জানত আসবে। উৎফুল্ল মুখে অভ্যর্থনা করল, এসো এসো, আমি তো ভেবেছিলাম কালই আসবে। এলে না যে?

কাল আসেনি, আজই বা কেন এলো শিবদাস জানে না। এখানে সান্ত্বনা রেস্ট হাউসের কর্ত্রী নয়। হাস্যে-লাস্যে কৌতুকময়ী প্রিয় সখীটি যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ও মূর্তি শিবদাস চেনে।

সান্ত্বনার প্রথম সঙ্কল্প সফল হল। মানুষটার কালো মুখ আরো কালো হয়েছে। অপাঙ্গে ভালো করে লক্ষ্য করে নিল একটু, পরে তেমনি কলকণ্ঠেই বলল, বোসো—চেহারার তো দিব্বি উন্নতি হয়েছে দেখছি, ডন-বৈঠক করছ না কি! সঙ্গীদের দিকে তাকালো, মিঃ দত্তগুপ্ত, একে চিনলেন।

শুধু দত্তগুপ্ত নয়, বাকি সকলেও চিনেছে। সামান্য একজন পুরানো ম্যানেজারের প্রতি এতটা প্রীতি বর্ষণের তাৎপর্য কেউ বুঝল না। আহূত হয়ে দত্তগুপ্তও তেমনি পরিহাস-তরল কণ্ঠে বিস্ময় জ্ঞাপন করল।—আই সি! আপনার পুরানো ম্যানেজার তো—ব্যট্ ইউ. পি. রাইস্ সিমস্ টু স্যুট্ হিম সো নাইস্। হি লুকস্ এ পা-ফেক্ট ডেভিল নাও!

শিবদাসের চোখ দু'টো স্বল্পক্ষণ পড়ে থাকে তার মুখের ওপর। বলল, রেস্টুরেন্টএ ম্যানেজারি করলেও একটু-আধটু ইংরেজী বুঝি মশাই, ইউ. পি'র চালের কাছে বাংলার চাল ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়তে পারে।

ছন্দপতন ঘটল। সান্ত্বনার মুখেও শঙ্কার ছায়া নামল। এমন সামান্য লোকের মুখে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় দত্তগুপ্ত। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

হোয়ট্!

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল শিবদাসও। দত্তগুপ্ত নীরবে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। পরে আবার চেয়ার নিল। বসল শিবদাসও।

নন্দী মনে মনে খুশি। লোহা-লক্কড়-পেটা শরীরের কথাটা মনে পড়ল বোধ হয়। মঞ্জুশ্রী এবং প্রফেসার রে' তখনো হতভম্ব। জের সামলাতে হল সান্ত্বনাকেই। অন্তত চেষ্টা করল সামলাতে। প্রথমে এক দফা হাসল খুব। অজস্র হাসি। পুরুষের চোখ বিভ্রান্ত করবার মত হাসি। পরে বলল, কাউকে রাগতে দেখলেই আমার হাসি পায়।—সত্যি বলছি মিঃ দত্তগুপ্ত, ও একেবারে রাগের ডিপো, কিন্তু তাহলেও লোক বেশ ভালো, বেশ নয়, খুব ভালো—তাই না?

শেষের প্রশ্নটা শিবদাসের ওপরেই নিক্ষিপ্ত হতে আবহাওয়া ফিরল একটু। কিন্তু শিবদাস আবার উষ্ণ হয়ে উঠছে মনে মনে। খানিক বাদে শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, রেস্ট হাউস চলছে ভালো?

সান্ত্বনা নিরীহ মুখে জবাব দিল, কই আর চলছে, লোকসান খেয়ে খেয়ে তো হায়রান হয়ে গেলাম।

এবারে মঞ্জুশ্রী সশব্দে হেসে উঠল। শিবদাস আবার জিজ্ঞাসা করল, এখানে আছ কত দিন?

তার তুমি সম্বোধনটা সকলের মনেই একটু-আধটু বিস্ময় উদ্রেক করল। সান্ত্বনা দু'হাত উল্টে জবাব দিল, এঁরা জানেন।

আচ্ছা, আবার দেখা হবে। কারো দিকে না চেয়ে বা কোনো রকম অভিবাদন না জানিয়ে সে ঘর থেকে বেবিয়ে গেল।

কিন্তু আবারও দেখা হল ঠিকই। পরদিনই। দলের সঙ্গে সঙ্গে এখানে-সেখানে ঘুরলও। কিন্তু কদাচিৎ কথা বলল। সেও সান্ত্বনা গায়ে পড়ে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে। তাকে কলকাতা ফিরিয়ে নেবার সঙ্কল্প প্রথম দিনের সাক্ষাতেই প্রায় বাতিল করেছে, তাই অন্তরঙ্গতা প্রকাশে খুব কার্পণ্য করল না। কিন্তু এই খাপছাড়া লোকটা সঙ্গে থাকাতে দলেব অর্ধেক আনন্দই মাটি। এমন কি অস্বস্তি লাগছিল সান্ত্বনারও। লোকটার চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে যেন কি আছে!

পরদিনও সকালের দিকেই এলো শিবদাস। সঙ্গিনী এবং সঙ্গীরা ইচ্ছে করেই কথা বলতে বলতে অন্য দিকে সরে গেল। সান্ত্বনা জানালো, মধ্যাহ্নে তারা যাচ্ছে 'ভুলভুলাইয়া' দেখতে। গোলকধাঁধা ভুলভুলাইয়া—হঠাৎ কি মনে পড়তে হেসে ফেলল। নিজের অজ্ঞাতেই জিজ্ঞাসা করল, তুমিও আসছ না কি?

যেতে পারি। কিন্তু তোমাব ও গোলকধাঁধার কাছে এ আর এমন কি!

আমারটাই বা কি এমন? সান্ত্বনার কণ্ঠেও পরিহাসের সুর বাজল, তুমি তো দিব্বি স্লুট্ করে বেরিয়ে আসতে পারলে।

শিবদাস চেয়ে আছে। অনাদরের নির্মম আঘাতে সকল আশা সকল আনন্দ ধূলিসাৎ করে একদিন তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে যে নারী, তার এই মৌখিক আদরে সে আর বিচলিত হবে কতটুকু? দেখছে চেয়ে চেয়ে। দেখছে রেস্ট হাউসএর সেই স্বার্থচারিণী মালিককে।

পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র শ্বাপদ যেমন স্থির দৃষ্টিতে লেহন করে কাছের অথচ নাগালের বাইরের শিকারকে।

…দেখছে। দেখছে আর যেন ভাবছে কি। হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল সে। বলল, আচ্ছা সেখানে থাকব আমি।

দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। নিজের উপরেই বিরক্ত হল সান্ত্বনা। কেন আবার আপ্যায়ন করতে গেল ছাই।

যথাসময়ে বড় ইমামবাড়ার ফটকে প্রবেশ করল তারা। ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন। ওরই দোতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত সেই রোমাঞ্চকর ভুলভুলাইয়া।

ইমামবাড়ার সিঁড়ির কাছে আসতে সকলেরই চোখ গেল অদূরে ঘাসের ওপর শিবদাস শুয়ে আছে। তাদের দেখে ধীরে-সুস্থে উঠে এলো। একমাত্র সান্ত্বনা ছাড়া সকলেই বোধ হয় মনে মনে কটূক্তি করল। সান্ত্বনাও কোনো সম্ভাষণ জানালো না।

সিঁড়ি ধরে উঠে প্রথমে বিশাল হল্ ঘর। দু'চার জন গাইড এগিয়ে আসছিল। কিন্তু অন্য দিক থেকে একজন বৃদ্ধ গাইডকে ইশারায় ডাকল শিবদাস। বলল, এই লোকটাই সব থেকে বেশি এক্সপার্ট। গাইড আ-ভূমি কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

তাদের নিয়ে হল্-ঘরে প্রবেশ করে গাইড মুখ ছোটালো। ইতিহাস আর গল্পের চাটনি। এ ধরনের এত বড় হল্-ঘর নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। নবাব আসাফউদল্লার কীর্তি। বিরাট দুর্ভিক্ষ লেগেছিল দেশে। খেতে না পেয়ে মানুষ পিঁপড়ের মত মরছিল। কিন্তু মোল্লা যাকে দেয় না কিছু, তাকেও দেয় আসাফউদল্লা। নবাব হাজার হাজার লোক লাগালেন এই ইমারত গড়তে। বদলে তারা খেতে পাবে। কিন্তু এত লোকে একখানি ইমারত গড়তে ক'টি দিন আর লাগতে পারে! তারপর তো আবার সেই উপবাস। বিচিত্র ফন্দি আঁটলেন নবাব আসাফউদ্দল্লা। দিনের বেলায় তারা যতটুকু গড়ে দিয়ে যায়, রাতের বেলায় নবাবকর্মচারী সেটা ভেঙ্গে ফেলে। এই করে দিনের পর

দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে অনিবার্য অনশনের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করলেন দয়ার অবতার নবাব আসাফউদ্দল্লা। দুর্ভিক্ষ দূর হতে তাদের নির্মাণ কাজ শেষ হল।

চোস্ত উর্দুতে ইতিহাসের গল্প শুনে মশগুল হয়ে গেল সবাই। সব কিছুর পিছনেই গাউড গল্প ফাঁদতে লাগল। সিংহাসন, সোনামোড়া আয়না, মোমের তাজিয়া, হাজার-পাতি ঝাড়—। তারা শুনছে, দেখছে। হঠাৎ মঞ্জুশ্রী বলল, ও মা! বেলা গড়িয়ে আসছে, ভুলভুলাইয়াতে উঠব কখন? পাঁচটার পরে তো আর উঠতে দেবে না।

দেখা গেল গাইড বাংলা বোঝে। জানালো, সেটা নিয়ম বটে, তবে নিয়মের কড়াকড়ি হুজুর আর হুজুরাণী বিশেষে নির্ভর করে। তা' ছাড়া পাঁচটার দেরিও আছে, ঠিক দেখা হবে।

অন্ধকার হয়ে যাবে না?

গাইড সেটা আর অস্বীকার করলে না। পায়ে পায়ে অগ্রসর হল সকলে। নন্দী জিজ্ঞাসা করল, ভুলভুলাইয়া কী?

ভুলভুলাইয়া? গাইড সাগ্রহে ঘুরে দাঁড়াল এবং গম্ভীর মুখে গল্প শুরু করল আবার:—ভুলভুলাইয়া হল বিচিত্র রকমের এক গোলক-ধাঁধা। দোতলা থেকে বিপুল প্রাসাদ-সৌধের ওই পাঁচতলা পর্যন্ত। বেগমদের সঙ্গে কোনো সুরসিক নবাব লুকোচুরি খেলত সেখানে। পরের নবাবেরা অবিশ্বাসিনী বেগমদের এখানে এনে ছেড়ে দিত। উপবাসে অনিদ্রায় দিনের পর দিন তারা আর্ত হাহাকারে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে বেড়াতো। পাগল হয়ে শেষকালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করত তারা। ভুলভুলাইয়ার একটি মাত্র প্রবেশ-পথ এবং বেরুবার পথও ওই একটিই। কিন্তু একবার ঢুকলে খুঁজে আর সে পথ বার করা যায় না।

গল্প শুনে মঞ্জুশ্রীর গা ছমছম করে উঠলো। বলল, আমার ভয় করছে, শেষে যদি না বেরুতে পারি! সান্ত্বনারও কপাল ঠুকে আত্মহত্যার কাহিনী শুনে কেমন লাগছিল। তবু ঠাট্টা করল, না বেরুতে পারলে

এঁদের মধ্যেও কেউ থেকে যাবেন, সুখে ঘরকর্না কোরো। বক্র কটাক্ষপাতটা অধ্যাপকের উদ্দেশে।

কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিল দত্তগুপ্ত। বলল, হুঁঃ, যত সব আজগুবি গল্প। বেরুতে দেরি হতে পারে, তা'বলে একেবারে বেরুনো যাবে না কি!

আভূমি নত হয়ে আবার কুর্নিশ করলে গাইড। বলল, বান্দার গোস্তাকি মাফ হয়, বেরুতে পারলে পাঁচ তলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে গর্দান দেবে সে, কিন্তু না পারলে হুজুর যেন খুশি হয়ে একখানা একশ' টাকার নোট্ নেক্‌নজর করেন।

এ রকম একটা বাজি ধরা কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু শুনে সকলেরই কৌতূহল উদ্দীপিত হল আরো।

গাইডের পিছন পিছন ভুলভুলাইয়ার সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠল সকলে। গাইড বলল, এই এক সিঁড়ি মিললে তবে নেবে আসা যাবে, কিন্তু দেখা যাক্ মেলে কি না। এঁকেবেঁকে নানা পথ ধরে সৌধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল সকলকে নিয়ে। ছোট বড় অগুণতি সিঁড়ি এবং অজস্র সরু সরু পথের অভিযান। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছে সব ঘুলিয়ে গেল। দোতলা থেকে তিনতলায় উঠেছে কখন তাও ঠাওর পেল না। অজস্র পথের জটিল সমারোহ আর অজস্র ওঠা নামা। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল গাইডের লুকোচুরি খেলা। হঠাৎ একটা দেয়ালের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ডাকলে, আইয়ে। আবছা অন্ধকারে সকলে অনুসরণ করল। ও মা! কোথায় আইয়ে! এ-ধার থেকে ডাকছে, আইয়ে! ও-ধার থেকে ডাকছে, আইয়ে! ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে—কিন্তু তার টিকিটি নেই। এ দিকে দলের মধ্যে হাসা-হাসি ছুটাছুটি পড়ে গেল। নিজেদের অজ্ঞাতেই ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে তারা। আশে-পাশে দূরে কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরছে সরু সরু কানা গলির মধ্যে! এ-ধার থেকে ও-ধার থেকে তাদের হাসির শব্দ প্রতি-ধ্বনিত হচ্ছে পাষাণপুরীতে। চকিতে কাউকে দেখা দেয় গাইড, ডাকে

আইয়ে, পরক্ষণেই কোন্ পথ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়, হদিস পায় না।

অন্ধকার হয়ে আসছে আরো। ফস্-ফস্ করে দেশলাই জ্বালা হচ্ছে বার বার। দত্তগুপ্তর হাঁপ ধরে গেল। এক দিক থেকে তার হাঁক শোনা গেল, গাইড! পরক্ষণে অবিকল তার কণ্ঠস্বর নকল করে দূর থেকে গাইড জবাব দিল, আইয়ে! আবার জমে উঠল। এ-দিক থেকে নন্দী ডাকে, ও-দিক থেকে মঞ্জুশ্রী, আর এক দিক থেকে রে। সকলেরই কণ্ঠস্বর নকল করে প্রত্যুত্তর দেয় গাইড। একটু বাদে বেশ দূর থেকে সান্ত্বনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল যেন। দত্তগুপ্ত আর মঞ্জুশ্রী তখন একত্র হয়েছে। মঞ্জুশ্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কি সাঙ্ঘাতিক লোকটা —ঠিক সান্ত্বনার গলা নকল করছে!

কিন্তু সে কণ্ঠস্বর নকল নয়। তাদের মধ্যেই কারো পদধ্বনি অনুসরণ করে সান্ত্বনাও ছিটকে পড়েছিল কোথা থেকে কোথায়। পথ হারিয়ে ফেলে পথ খোঁজার নেশায় সে-ও মেতেছিল। সত্যিই তো আর ভয়ের কিছু নেই। কত দূরে এসেছে, এত বার ওঠা-নামা করে কোন্ তলায় আছে কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না, মজা লাগছিল বেশ।...একটা গাঢ় অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে পড়ে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণে মনুষ্য-স্পর্শে থরথর করে কেঁপে উঠল সে! সহসা কার দু'টো কঠিন বাহুর নির্মম নিষ্পেষণে দেহের হাড়গোড়-সুদ্ধ যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগল তার। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল একবার। দ্বিতীয় বারের চেষ্টা এক হিংস্র অধরগহ্বরেই বিলীন হল।...দ্রুত...দ্রুত...দ্রুত হারিয়ে ফেলছে সান্ত্বনা নিজেকে। হাল ছেড়ে দিল। হারিয়ে গেল।...অব্যক্ত যন্ত্রণা।...অব্যক্ত বিস্মৃতি!...নিশ্চেতন...কল্পান্ত!

গাইডের উদ্দেশে দত্তগুপ্তর উত্তেজিত বকাবকি শুনে যেন এক যুগ বাদে চেতনা ফিরল সান্ত্বনার। অনেকগুলি পদধ্বনি। উর্দুভাষী গাইডের বিনম্র আকুতি,—এক্ষুনি তল্লাস মিলে যাবে হুজুর, ঘাবড়িও না। দেওয়াল ধরে ধরে সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল। দেহের সব বাঁধুনি যেন

পৃথক হয়ে গেছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল, সংবৃত করল। পারছে না, তবুও।

তাকে আবিষ্কার করে সকলে কলকণ্ঠে চেঁচামচি করে উঠল। দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলোতেও নিঃসাড় পাণ্ডুর মূর্তিটি চোখে পড়ল সকলের। ভাবল, ভয় পেয়েছে খুব। মঞ্জুশ্রী বলল, আধ ঘন্টা ধরে ডাকাডাকি করছি, একটা সাড়া দিলে না পর্যন্ত, ফিট হয়ে গেছলে না কি! হাত ধরল।

দত্তগুপ্ত এবং নন্দী গাইডকে ধরে সেখানেই মারে আর কি।

শ্রান্তক্লান্ত হয়ে গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার তাড়ায় আর একজনের কথা অন্তত এদের কারো মনে নেই। শিবদাস। বাইরে এসে দেখা গেল আবছা অন্ধকারে সে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সান্ত্বনা কোনো দিকে দৃকপাত না করে সোজা গাড়িতে উঠল।··· হোটেল। তারপর কলকাতা!

সান্ত্বনার পরিবর্তন দেখে সঙ্গী-সাথীরা আকূল পাথারে পড়ল। বিস্মিত হল, উদ্বিগ্ন হল, বেদনাহত হল তার অস্বাভাবিক ব্যবহারে। দিন যায়, মাস যায় একটা, তুটো। কিন্তু মুখে সেই তুরূহ গাম্ভীর্যের বর্ম আঁটা। রেস্ট হাউসে আসে, নিজের চেম্বারে বসে থাকে চুপ করে, অতিথি অভ্যর্থনায় হাসিমুখে এগিয়ে আসে না আর, কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে না বড় একটা। মাঝে মাঝে কামাইও করে। বেগতিক দেখে দত্তগুপ্ত বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। নন্দীও। কিন্তু ওর ভ্রূকুটিতে মুখ চুন করে ফিরে গেছে।

শেষে একদিন মঞ্জুশ্রীকে নিজে থেকেই ডেকে এনে রেস্ট হাউসের কিছুটা অংশ লেখাপড়া করে দিল। দেখাশুনার সকল ভার অর্পণ করল তার ওপর। এতদিনের আশা!···বিচলিত হয়ে মঞ্জুশ্রী জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বলবে না?

সান্ত্বনা ক্ষুদ্র জবাব দিল, কিছু না।

হয়েছে যা, তার স্থূল দিকটার জন্যে সান্ত্বনার এমন অস্বাভাবিক

পরিবর্তন নয়। টাকা আছে। টাকা থাকলে ব্যবস্থাও আছে। বিজ্ঞানের যুগ। ব্যবস্থা এক রকম করেই রেখেছে। ইতিমধ্যেই নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু থাক না, তাড়া কি !···অন্য পরিবর্তনটাই বিষম। ওই সম্ভাবনাটুকু একেবারে নির্মূল করে ফেলতেমন চাইছে না, এ সত্য নিজের কাছেও যে গোপন থাকছে না আর! তা'ছাড়া, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে কল্পনায় মানুষদানবকে ফাঁসিতে লটকেছে দিনে ক'বার করে আর নির্মম আনন্দ উপভোগ করেছে তার তাজা দেহের ছটপটানি দেখে, তারই সেই পশু-শক্তিটা আজও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে আছে অক্টোপাসের মত। সেই অব্যক্ত যাতনা, আর অব্যক্ত বিস্মৃতি···।

সব শেষে নিজের ওপরেই আগুন হয়ে উঠল সান্ত্বনা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি নয়। আর দুর্বলতাও নয়। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট করল ডাক্তারের সঙ্গে।···টাকা নিল। মোটা টাকা লাগবে। মোটা টাকাই নিল। কিন্তু মোটরে বসে সমস্ত দেহমন যেন শিথিল হয়ে আসছে আবার। মনে হল, একটা নির্মম হত্যা অনুষ্ঠিত করতে চলেছে সে। হত্যা?···হত্যা বই কি।···তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ড্রাইভারকে যে দিকে যেতে আদেশ দিল সান্ত্বনা, সেটা হাওড়া স্টেশনের পথ।

কিন্তু দিন কতকের মধ্যেই ফিরল আবার···। ফিরল একা। ফিরল ভুলভুলাইয়ার দেশ থেকে। বাসস্থান বদলে ফেলল সকলের অজ্ঞাতে। রেস্ট হাউস চলে। মঞ্জুশ্রী চালায়। নতুন আবর্তের সৃষ্টি হয় তাকে ঘিরে। সান্ত্বনা খবর রাখে না। সারাক্ষণ দরজা বন্ধ তার ঘরের। সান্ত্বনা পথ হারিয়েছে। ভুলভুলাইয়ার একটি মাত্র পথ। সে পথের খোঁজ দেবে যে, সে নিখোঁজ।